CHILDREN'S BOOK TRUST · NEW DELHI

দাদুর বাড়ি





দাদুর বাড়ি

লেখা ও ছবি—**শঙ্কর** অনুবাদ—**লীলা মজুমদার**

চিল্ড্রেন্স বুক ট্রাস্ট নিউ দিল্লী

Life With Grandfather
Written and Illustrated by Shankar

First English Edition: 1965
Reprint: January 1966, November 1966, Febauary 1967, June 1967,
September 1968, December 1970, October 1971, April 1976,
September 1979, May 1982,

Dadur Bari: Bengali translation by Lila Majumder
First Bengali Edition: 1967
Reprint: May 1982.

Published by the Children's Book Trust, Nehru House, 4, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi,
and printed at the Trust's press, the Indraprastha Press, New Delhi

ভূমিকা

মন্ত্রী পররাষ্ট্র মন্ত্রিশালা

'দাদুর বাড়ি' বইখানি হল কেরালার একটি পরিবারের একজন ছোট ছেলের নানান্ চিত্তাকর্ষক অভিজ্ঞতার কাহিনী। রাশভারি ঠাকুরদা, সহৃদয় কাকা, স্নেহময়ী ঠাকুমা, এমন কি হরিজন ঝি চিরুথা, স্পষ্টভাবে পরিকল্পিত রক্তমাংসের মানুষ সবাই, কেরালার পারিবারিক জীবনের প্রতীকৃস্বরূপ, যেন জীবন্ত হয়ে দেখা দিচ্ছে।

রাজার শৈশবটি বড় সুখের, চারিদিকে তার সহৃদয় গুরুজনরা, তাঁদের ভয়ভক্তিও করতে হয়, ভালোবাসতেও হয়। এ জীবন প্রকৃতি ও সব রকম প্রাণীর সঙ্গে সুর মিলিয়ে চলে। রাজার জীবনের ঘটনাগুলির মধ্যে দিয়ে তার নিজের সরলতা ও কর্মকুশলতা, প্রাকৃতিক জগতের প্রতি অনুরাগ, জন্তু-জানোয়ারের প্রতি ভালোবাসা, পরম নির্ভীকতার সঙ্গে শাস্তি পাবার ভয়, সমস্তই ফুটে উঠছে। এত কড়াকড়ির মধ্যেও কিন্তু ছোট ছেলেটা যথেষ্ট স্বাধীনতা উপভোগ করে।

এ ধরণের জীবনযাত্রায় ভগবানে বিশ্বাস ও গুরুজনে শ্রদ্ধা একটা বড় ভূমিকা নেয়। মাতৃহারা শিশু ও তার গুরুজনদের মধ্যে এক অপূর্ব সৌহার্দ্য দেখা যায়।

এ বইয়ের সুচিত্রিত পাতাগুলিতে একজন শিশুর জীবনকাহিনী কথা দিয়ে রং দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে। ছোট ছেলের খেয়াল-খুসির প্রতি গভীর সহানুভূতি শাসনের রূঢ়তাকে কোমল করে এনেছে। রাজার ছবি আঁকার চেষ্টার মধ্যে ভবিষ্যৎ কার্টুনশিল্পীর সম্ভাবনা সম্বন্ধে সন্দিহান হলেও, কেরালা পরিবারে যাঁরা মানুষ হয়েছেন, তাঁদের মধ্যে কেউ এ কাহিনীর সততা নিয়ে প্রশ্ন করবেন না। হাতি আর কুমীর, কাঠবেড়ালি ও চিল, মন্দির আর সাপের ওঝা, এদের কথা শুনে দ্রুত অপস্রিয়মাণ এক ধরণের জীবনের কত কথাই না মনে পড়ে।

বৃহত্তর পাঠকবর্গের সানন্দ দৃষ্টির সামনে এ কাহিনী তুলে ধরে চিল্‌ড্রেন্স বুক ট্রাস্ট বড় ভালো কাজ করেছেন।

লক্ষ্মী এন্ মেনন

নিউ দিল্লী
২৫শে নভেম্বর ১৯৬৫



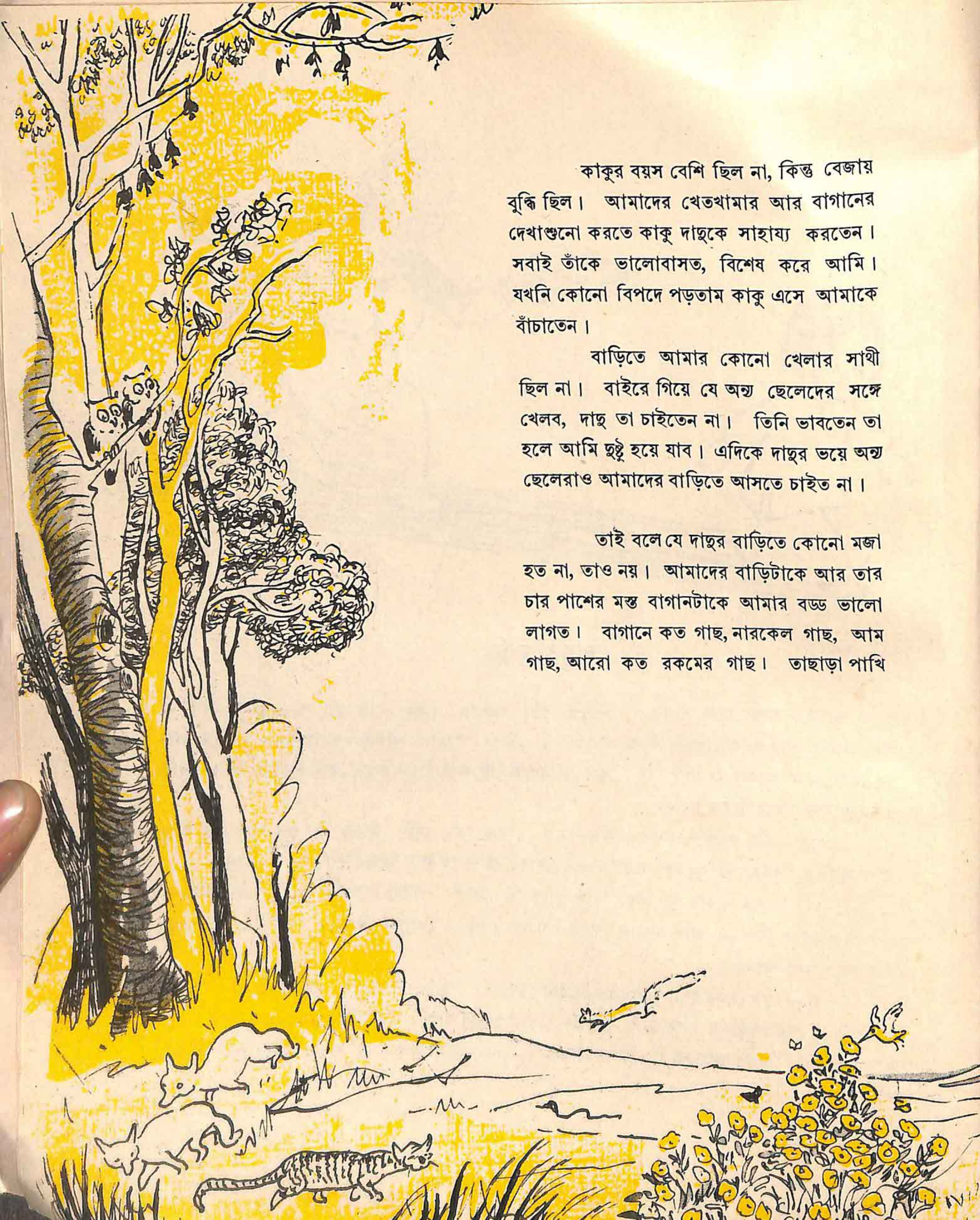
দাদুর বাড়ি

সবাই আমাকে রাজা বলে ডাকত। অবিশ্যি ওটা আমার আসল নাম নয়, তবু ভালো লাগত। আমি আমার দাদু আর ঠাকুমার সঙ্গে থাকতাম। ওঁরাই আমার অভিভাবক ছিলেন। আমি যখন খুব ছোট, তখন আমার মা মারা যান। বাবা আমাকে দাদু আর ঠামুর কাছে রেখে দিয়েছিলেন। ওঁরাই আমাকে মানুষ করেছিলেন।

মস্ত একটা বাড়িতে আমরা থাকতাম। লোক কিন্তু বেশি ছিলাম না, শুধু দাদু ঠামু কাকু আর আমি। আমাদের অনেক আত্মীয়-স্বজন ছিলেন, তাঁরা যে যার নিজের বাড়িতে থাকতেন।

দাদু ছিলেন মাথায় খুব লম্বা আর গায়ে কি জোর! সর্বদা বাজখাঁই গলায় কথা বলতেন, গ্রামের সবাইকে চিনতেন আর তারাও তাঁকে খাতির করত। উপদেশ কিম্বা সাহায্য দরকার হলেই, তাঁর কাছে ছুটে আসত।

ঠামুর মনে যেমন দয়া, ব্যবহারও তেমনি কোমল। তিনি আমার খুব যত্ন করতেন। ছায়ার মতো পিছন পিছন ঘুরতেন আর খালি বলতেন—'ওরে দুধটুকু খা।' 'খাবারটা খেয়েই ফেল্ না।' 'চান করে নে রে!' 'এবার শুতে যা।' এসব আমার মোটেই ভালো লাগত না, তবু ঠামুকে খুব ভালো-বাসতাম।



কাকুর বয়স বেশি ছিল না, কিন্তু বেজায় বুদ্ধি ছিল। আমাদের খেতখামার আর বাগানের দেখাশুনো করতে কাকু দাদুকে সাহায্য করতেন। সবাই তাঁকে ভালোবাসত, বিশেষ করে আমি। যখনি কোনো বিপদে পড়তাম কাকু এসে আমাকে বাঁচাতেন।

বাড়িতে আমার কোনো খেলার সাথী ছিল না। বাইরে গিয়ে যে অন্য ছেলেদের সঙ্গে খেলব, দাদু তা চাইতেন না। তিনি ভাবতেন তা হলে আমি দুষ্টু হয়ে যাব। এদিকে দাদুর ভয়ে অন্য ছেলেরাও আমাদের বাড়িতে আসতে চাইত না।

তাই বলে যে দাদুর বাড়িতে কোনো মজা হত না, তাও নয়। আমাদের বাড়িটাকে আর তার চার পাশের মস্ত বাগানটাকে আমার বড্ড ভালো লাগত। বাগানে কত গাছ, নারকেল গাছ, আম গাছ, আরো কত রকমের গাছ। তাছাড়া পাখি

ছিল, প্রজাপতি ছিল, মৌমাছি ছিল। অনেকগুলো পুকুর ছিল, তাতে মেলা মাছ। মাছরাঙা, সারস আর অন্য সব জলের পাখি মাছ ধরবার জন্য পুকুর ধারে আসত।

এক কোণে একটা কুঞ্জবনের মতো ছিল, সেখানে গাছপালা লতা আর ঝোপের বন। ঐ বনে শেয়াল বেজি বনবেড়াল আর প্যাঁচা থাকত। আমাদের অনেক ষাঁড় আর বলদ ছিল। ছোট বাছুরগুলো সারা বাগানে দৌড়-ঝাঁপ করে বেড়াত।

বাছুরদের সঙ্গে খেলা করতে আমার খুব মজা লাগত। বাগানের পাখিদের দেখতেও ভালো লাগত। চেয়ে থাকতাম কখন বন থেকে শেয়াল বেরোয়। বেজির পিছনে ছুটতাম ; প্রজাপতি, সাপ, গিরগিটি ধরতাম।





সাপের কামড়

একবার বাড়ির হাতায় একটা সাপ দেখলাম। সাপটা আস্তে আস্তে বুকের উপর হেঁটে যাচ্ছিল। আমাকে দেখতে পেয়েই তাড়াতাড়ি গিয়ে একটা নারকেলের খোলার মধ্যে লুকোল। আমিও পা টিপে টিপে এগিয়ে একটা পাথর দিয়ে নারকেল খোলার মুখটা চেপে ধরলাম। তারপর সেটাকে তুলে নিয়ে এক দৌড়ে একেবারে ঠামুর কাছে হাজির হলাম।

'এই দেখ, ঠামু, সাপ ধরেছি।'

ঠামু আঁৎকে উঠলেন, 'সাপ ধরেছি আবার কি!' তিনি তো ভয়েই সারা! চিৎকার করে লোক ডাকতে লাগলেন। অমনি দাদু দৌড়ে এলেন। যেই দাদু শুনলেন নারকেল খোলায় করে সাপ এনেছি, খোলাটা আমার হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে, ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। সাপটাও বেরিয়ে পড়ে গুড়-গুড় করে ঝোপের পিছনে অদৃশ্য হল।

দাদু তখন আমাকে সাবধান করে দিলেন কখনো যেন সাপের কাছে না যাই। সাপরা বড় সাংঘাতিক।

সেদিন সন্ধ্যায় আমি মৌমাছি ধরতে চেষ্টা করছিলাম, একটা মৌমাছি দিল আমার হাতের আঙুলে হুল ফুটিয়ে। খচ্ করে ব্যথা লাগতেই ছুটে ঠামুর কাছে গিয়ে বললাম, 'আমাকে কিসে কামড়িয়েছে। ভীষণ ব্যথা করছে। কিছু করে ব্যথা সারিয়ে দাও, ঠামু।' ঠামু ভাবলেন নিশ্চয় সাপে কামড়িয়েছে, দাদুকে ডেকে বললেন শীগগির এসে একবার দেখতে।

দাদু তক্ষুণি এলেন। তাকিয়ে দেখেন আঙুলে নীল দাগ। আর কথা নয়, আমাকে কোলে তুলে দৌড় দিলেন, বাগান পেরিয়ে, ধান-খেতের মাঝখান দিয়ে। সে কি দৌড়! আমাদের বাড়ি থেকে বেশ খানিকটা দূরে একটা ছোট বাড়িতে না পৌঁছে থামলেন না। সেখানে পৌঁছেই বাড়ির মালিককে ডাকাডাকি করতে লাগলেন।

একজন পাকাচুল বুড়ো বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল।





সে সাপের কামড়ের ওষুধ জানত। দাদু তাকে বললেন আমাকে ভালো করে দিতে। লোকটা আমাকে ঘরের ভিতরে নিয়ে গেল। তারপর আঙ্গুলটা দেখে বলল, 'চুপ করে বসে থাকো, নড়ো-চড়ো না।' আমি দাদুর কোলে বসে রইলাম।

একটা পিতলের ঘটিতে একটু জল নিয়ে, বুড়ো কি সব মন্ত্র পড়তে লাগল। ভাবলাম বলি যে সাপে কামড়ায় নি, মৌমাছিতে হুল ফুটিয়েছে। কিন্তু দাদু আমাকে চেপে ধরে বসে রইলেন, কথাই বলতে দিলেন না। ততক্ষণে ঠামু এসে পড়েছেন, সঙ্গে অনেক লোকজন। সকলে চুপ করে হাঁড়ি মুখে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন।

এদিকে আমার আঙ্গুলের ব্যথা সেরে গেছে, তবু সাপের কামড় সারাবার জন্য বসে থাকতে হল।

কয়েক মিনিট বাদে, বুড়ো উঠে আঙ্গুলটা ধুয়ে, একটু জল খেতে দিল। তারপর আমাকে আরো কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকতে বলল। শেষে দাদুর দিকে ফিরে বলল, 'ভাগ্যিস্ সময় মতো নিয়ে এসেছিলেন। যাক, এখন আর কোনো ভয় নেই। সত্যি খুব বিষাক্ত সাপেই কামড়িয়েছিল।'

আমাকে এমন আশ্চর্য ভাবে সারিয়ে দেবার জন্য দাদু ঠামু আর অন্য সবাই বুড়োকে বার বার ধন্যবাদ জানালেন। বাড়ি ফিরে দাদু তাকে অনেক উপহার পাঠিয়ে দিলেন।

●



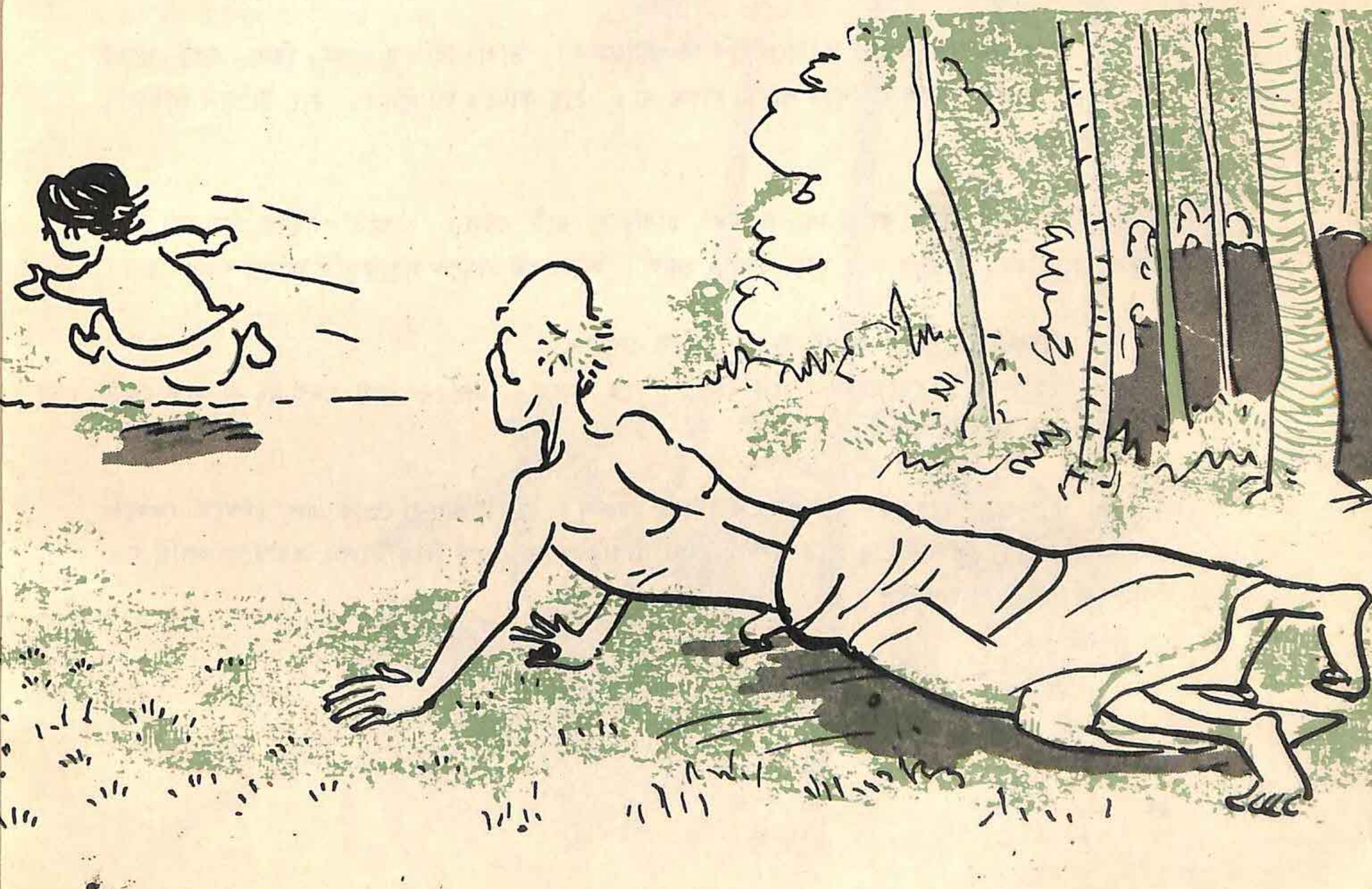
বৃষ্টি করা

খুব বৃষ্টির পর সন্ধ্যা নেমেছে। চন্দন গাছের নিচে যুঁইফুলের ঝোপ থেকে দাদু ফুল তুলছিলেন। গাছের পাতা জলে বোঝাই। আমি জানতাম কি করে গাছ ঝাঁকিয়ে বৃষ্টি করতে হয়। তা হলে দাদুর আর আমার গায়ে বেশ এক পশলা বৃষ্টি পড়ে। বৃষ্টির জলে স্নান করতে আমার খুব ভালো লাগত।

অবিশ্যি দাত্নর ভালো নাও লাগতে পারে। তবু ভারি মজা হয়।

কাজেই গুটিগুটি চন্দন গাছের কাছে গিয়ে দিলাম কষে গায়ের জোরে নাড়া। বেজায় বৃষ্টি পড়ল। দাত্ন আর আমি ভিজে চুপপুড়! আমার খুব ভালো লাগল, কিন্তু দাত্নর তা লাগল না। চোখ পাকিয়ে আমার দিকে তাকালেন। ঠিক বুঝলাম, ধরলেই আমাকে পেটাবেন। দিলাম চোঁ-চাঁ দৌড়। দাত্নও পিছন পিছন ছুটলেন। আমি যত জোরে দৌড়লাম, দাত্ন তার চেয়েও জোরে দৌড়লেন। প্রায় ধরেই ফেলেছিলেন, এমন সময় হোঁচট লেগে আছাড় খেলেন। আমি ছুটে ধান খেতে লুকোলাম। শুনতে পেলাম দাত্ন চেঁচিয়ে বলছেন—বাড়ি ফিরলেই আমাকে শিক্ষা দেবেন।

বাড়ি ফিরতে ইচ্ছা করছিল না, ভয় হচ্ছিল দাত্ন মারবেন। ধানখেতেই থেকে গেলাম। রাত হয়ে এল। অন্ধকারে একা ভয় করছিল। যত ভূতের গল্প শুনেছিলাম, সব মনে পড়তে লাগল। উঠে দাঁড়িয়ে, চারদিক দেখে, বাড়ির দিকে ছুটলাম।



দাদুর সামনে যেতে তখনো ভয় করছিল। কাজেই সোজা বাড়িতে না ঢুকে, গোয়ালঘরের মাচায় আশ্রয় নিলাম। সেখান থেকে দেখতে পাচ্ছিলাম দাদু বারান্দায় বসে পুজো করছেন।

ঠামু আমার জন্যে বসেছিলেন। আমি আসছি না দেখে, সারা বাড়ি খুঁজে বেড়ালেন। তারপর বাইরে এসে আমাকে ডাকতে লাগলেন, বোধ হয় ভাবলেন বাগানে কোথাও আছি। কোনো উত্তর পেলেন না। তখন দাদুকে জিজ্ঞাসা করলেন আমি কোথায়। দাদু বললেন,

'ঘরের মধ্যে খুঁজে দেখ, কোথাও লুকিয়ে আছে।'
ঠামু বললেন, 'ঘরে নেই, সব জায়গায় দেখেছি।'
তখন দাদু উঠে পড়ে বাইরে এসে চেঁচিয়ে বললেন,
'এসো, রাজা, এসো। আমি তোমাকে মারব না।'
তবু উত্তর দিলাম না। ভাবলাম নিশ্চয় মারবেন।

ঠামু রেগে বললেন, 'ও আসবে না। তুমি ওকে তাড়িয়ে দিয়েছ। তখন শুনলাম তুমি বলছ বাড়ি এলেই পেটাবে। বেচারি তোমার ভয়ে পালিয়ে গেছে।

দাদু চাকরদের ডেকে আমাকে খুঁজতে পাঠালেন। তারা বেরিয়ে গেল, কিন্তু একটু পরেই ফিরে এসে বলল আমাকে কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না। ঠামু কাঁদতে লাগলেন। দাদু উঠোনে পাইচারি করতে লাগলেন।

আমাকে পাওয়া যাচ্ছে না, এ খবর চারদিকে রটে গেল। প্রথমে পাড়ার লোকরা এল তারপর আত্মীয়রা, তারপর আর যারা খবরটা শুনল। অনেকেই ঠামুকে সহানুভূতি জানাতে এসেছিল।

দাদুর এসব ভালো লাগল না। চেঁচিয়ে বললেন,

'কিচ্ছু হয় নি ছেলেটার। কোথাও লুকিয়ে আছে। এখানে বসে সময় নষ্ট না করে, কেউ কি ওকে খুঁজে আনতে পার না?'

তাই শুনে কয়েকজন উঠে আমার খোঁজে বেরুল। ক্রমে আরো লোক এল, দেখতে দেখতে ভিড় জমে গেল। ততক্ষণে ঠামু আর আমার দেখা পাবার আশা ছেড়ে দিয়েছিলেন, সবাইকে বলছিলেন আমি কি রকম ভালো ছেলে!

যারা খুঁজতে বেরিয়েছিল তারা আমার দেখা না পেয়ে ফিরে এল।

ঠামু ডুকরে কাঁদতে লাগলেন। ভিড়ের মধ্যে মেয়েরাও কাঁদতে লাগল। বাড়ির চাকররাও তাতে যোগ দিল। তাদের ভাব দেখে মনে হচ্ছিল আমি বুঝি মরে গেছি।

ঠামুর জন্য বড্ড কষ্ট হচ্ছিল, বেরিয়ে আসতে ইচ্ছা করছিল।

দাত্বর খুব মনের জোর ছিল, তবু আমি টের পাচ্ছিলাম তাঁরও দুঃখ হচ্ছে। তাই বলে তিনি আশা ছাড়েন নি। উঠে দাঁড়িয়ে আমাদের ঠাকুরঘরের দিকে ফিরে, তিনি প্রার্থনা করতে লাগলেন।



'ভগবান, আমার সহায় হও। আমার ছেলেটিকে ফিরিয়ে দাও। তাকে আমি এখনি চাই আর অপেক্ষা করতে পারছি না।' এই বলে দাত্ব চুপ করে দাঁড়িয়ে ভগবানকে ডাকতে লাগলেন।

ঠিক সেই সময় কাকু বাড়ি ফিরলেন। ফিরেই সমস্ত ব্যাপার শুনলেন। চারিদিক দেখেই বুঝে নিলেন আমি কোথায়। গোয়ালঘরে ঢুকে বললেন, 'নেমে এসো।' আমি নেমে এলাম। কাকু আমাকে ঘরে নিয়ে গেলেন।

দাত্বর প্রার্থনা সবে শেষ হয়েছে, চোখ খুলেই দেখেন আমি সামনে দাঁড়িয়ে। আনন্দের চোটে আমাকে কোলে নিয়ে, আদর করে বললেন, 'ভগবান আমার প্রার্থনা শুনে তোকে আমাদের কাছে ফিরিয়ে দিয়েছেন।'





ভগবানের দান

দাদু খুব ধার্মিক ছিলেন। দিনের মধ্যে অনেকবার উপাসনা করতেন। মন্দিরে গিয়ে দেবতাদের নৈবেদ্য দিতেন। প্রায়ই দেশের নানান পবিত্র জায়গায় তীর্থ করতে যেতেন।

আমাদের গ্রামে আর তার আশেপাশে অনেক মন্দির ছিল। যাতে আমাদের পরিবারের মঙ্গল হয়, সৌভাগ্য হয়, তাই দাদু অনেক মন্দিরে পূজা দিতেন।

প্রত্যেক শুক্রবার একটা বড় মন্দিরে দাদু আমার ভালোর জন্য বিশেষ পূজোর ব্যবস্থা করতেন।



কাজেই সেদিন আমাকেও ওঁর সঙ্গে মন্দিরে যেতে হত।

মন্দিরে যেতে আমার ভালো লাগত। সেখানে কত সুন্দর সুন্দর দেখবার জিনিস ছিল। বাড়িটাও খুব সুন্দর, অন্য সব বাড়ি থেকে আলাদা রকমের। সন্ধ্যা হলে শত শত তেলের বাতি জ্বালা হত। ফুল থাকত, ফুলের মালা থাকত। বাজনা বাজত। শাঁখ বাজত, ঘণ্টা বাজত।

তাছাড়া চমৎকার পোষাক আর সুন্দর গয়না পরা ভগবানের মূর্তি ছিল।

আমাদের বিশেষ পূজো হত অনেক রাতে। যেই সময় হত, আমরা ভিতরে গিয়ে বেদীর সামনে বন্ধ দরজার কাছে অপেক্ষা করতাম। একটু পরেই ঘণ্টা বাজত, শাঁখ বাজত আর দরজাটা খুলে যেত। ঐ হল আমাদের উপাসনার সময়। দাদু খুব বিনয় আর ভক্তির সঙ্গে প্রণাম করতেন। তাঁর নাতিকে, অর্থাৎ আমাকে, ভগবান যেন আশীর্বাদ করেন, এই বলে প্রার্থনা করতেন।

আমিও প্রার্থনা করতাম। কিন্তু ভগবানের কাছে বড় কিছু চাইতাম না। ছোটখাটো যে সব জিনিসের তখন শখ হত, তাই চাইতাম। একটা জিনিসও পেতাম না। মাঝে মাঝে কিছু হাতখরচ চাইতাম ; একবার ভেবেছিলাম সত্যি বুঝি ভগবান তাই দিলেন।

একদিন সন্ধ্যাবেলায় দাদু আর আমি মন্দিরে যাচ্ছিলাম।



যাবার পথে আমরা মন্দিরের পুকুরে স্নান করলাম। পুকুর থেকে উঠে আসবার সময় দেখি বালির উপরে কি একটা চকচক করছে। তুলে দেখি একটা রূপোর টাকা। খুব খুসি হলাম। ভাবলাম ওটা নিশ্চয় ভগবানের দান।

মন্দিরে পেঁাছেই দাদুকে ভগবানের দানটার কথা বললাম। দাদু বললেন, 'কোথায় পেলে?' আমি বললাম যে ভগবান ওটা আমার জন্য বালির উপরে ফেলে রেখেছিলেন। দাদু কিছু বললেন না।

মন্দিরে গিয়ে আমরা প্রার্থনা করলাম। তারপর দাদু আমার দিকে ফিরে টাকাটা চাইলেন। আমার দিতে ইচ্ছা করছিল না। দাদু তখন ওটা দিয়ে দিতে হুকুম করলেন। কাজেই ভগবানের দানটাকে হাতছাড়া করতেই হল। দাদু টাকাটা পুরোহিতকে দিয়ে দিলেন।

দাদুর উপর একটু রাগ হয়েছিল। বাড়ি পেঁাছানো অবধি একটাও কথা বলি নি। বাড়ি পেঁাছে, আমার দিকে ফিরে দাদু বললেন, 'কি হল? মুখ যে হাঁড়ি? টাকাটার জন্য নাকি?'

আমি কথা বললাম না।

তখন দাদু বললেন, 'যে টাকাটা কুড়িয়ে পেয়েছিলে, সেটা মোটেই ভগবানের দান নয়। ভগবান ওভাবে দান করেন না। যদি খুব খাটো, ভগবান তোমাকে অনেক টাকা রোজগার করতে সাহায্য করবেন। যে-টাকা নিজে রোজগার কর নি, তাতে হাত দেওয়া উচিত নয়।



চিরুথার ভালোবাসা

চিরুথা আর তার স্বামী আমাদের বাড়ির বেশ কাছেই একটা ছোট বাড়িতে থাকত। ওরা ছিল গরিব। লোকে ওদের হরিজন বলত। ওরা আমাদের ছুঁতে, কিম্বা আমাদের ঘরে ঢুকতে পেত না। তবু চিরুথা আমাদের বাড়ির লোকের মতোই ছিল। সে ঠামুর অনেক সাহায্য করত। রোজ বাজারে গিয়ে ঠামুর সংসারের সব দরকারী জিনিস কিনে এনে দিত। সংসারের জিনিস থেকে ঠামু চাল আর নারকেল বাঁচাতেন, চিরুথা সেগুলোকে বিক্রি করে আসত।

রং কালো হলেও চিরুথা ভারি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকত আর দেখতেও সুন্দর ছিল। সর্বদা সে সাদা কাপড় পরে থাকত।

চিরুথার মনে বড় দুঃখ। তার ছেলেপুলে ছিল না। তার বড় ছেলের শখ।

সে আমাকে খুব ভালোবাসত। আমারও ওকে ভালো লাগত। ও আমাকে কত আদরের নামে ডাকত আর বলত একদিন আমাকে কোলে নিয়ে চুমো খাবে। কেন যে খায় না তাই ভাবতাম।

এক দিন আমি বাগানে রয়েছি, সেই সময় চিরুথা ঐ দিক দিয়ে যাচ্ছিল। আমাকে দেখেই, থেমে, চারদিকে তাকাল। আশে-পাশে কেউ ছিল না। চিরুথা কাছে এসে, আমাকে কোলে তুলে, আদর করে, আমার গালে চুমো খেল।

হঠাৎ একটা চিৎকার শোনা গেল। দাদুর গলা। চিরুথা ভয় পেয়ে, আমাকে নামিয়ে রেখে, দে দৌড়! দেখলাম একটা মস্ত লাঠি নিয়ে দাদুও ওর পিছন পিছন ছুটছেন। ও পালাবার আগেই ওর পিঠে দুই এক ঘা পড়ল।

রেগে মেগে কি সব চ্যাচাতে চ্যাচাতে দাদু ফিরে এলেন। ঠামুও বেরিয়ে এসে বললেন, 'এত চ্যাঁচামেচি কিসের?' দাদু গর্জন করে উঠলেন, 'তুমি! তোমার জন্যই এটা হল! তুমিই চিরুথাকে এনেছ! এখন তার কাণ্ড দেখ! রাজাকে কোলে নিয়েছিল। তুমিও এ বাড়ি থেকে চলে যেতে পার। চিরুথাকে যখন এতই পছন্দ, যাও না, ওর বাড়িতেই থাক গিয়ে। আমি একাই ছেলেটার দেখাশুনো করব।'

ঠামু বললেন, 'তাতে চ্যাঁচাবার কি আছে? চিরুথা যদি রাজাকে ছুঁয়েই থাকে, ওকে স্নান করতে বল, তবেই তো ল্যাঠা চোকে।'

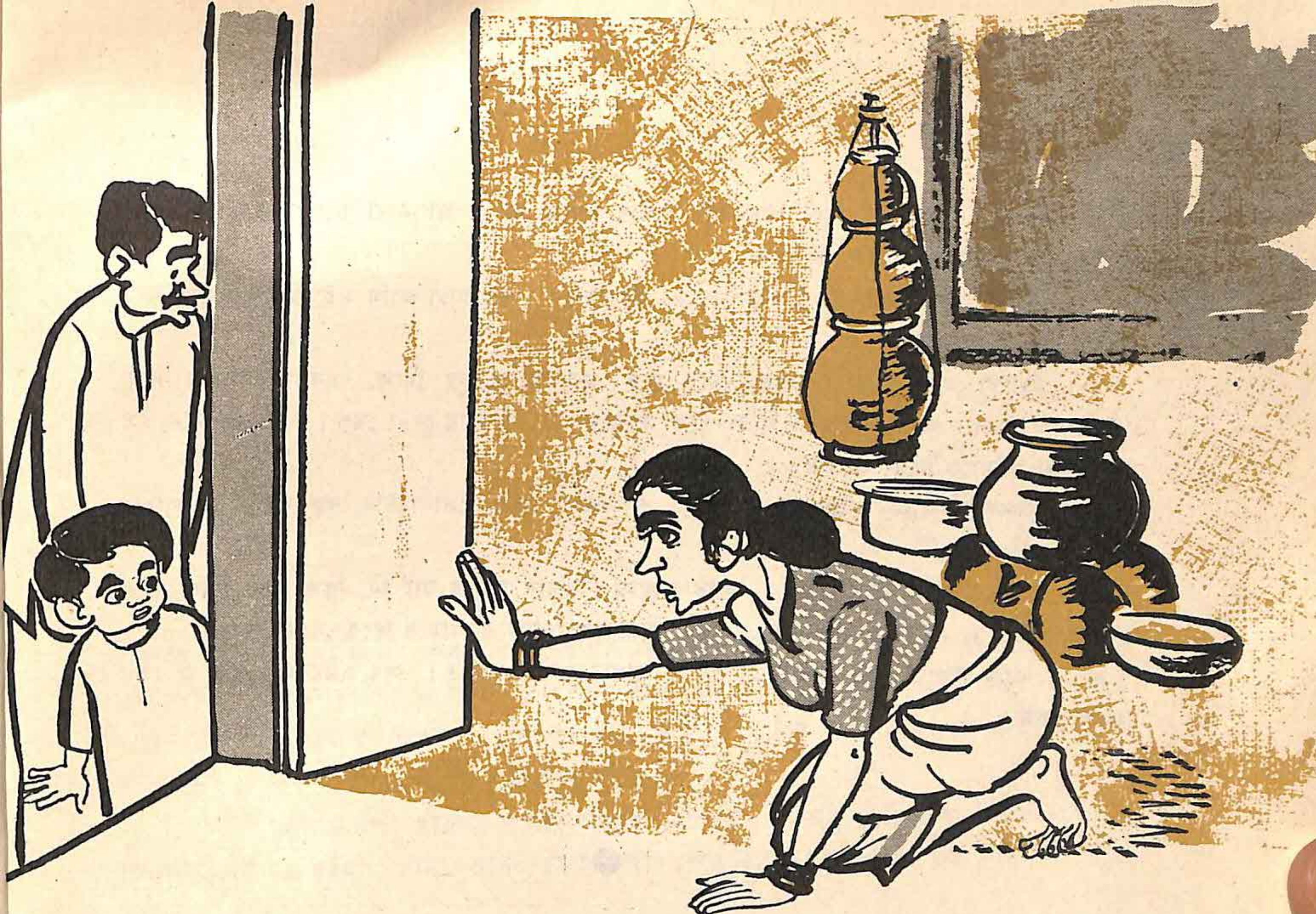
দাদু আমার কাছে এসে, হাত ধরে, হিড়হিড় করে টেনে, পুকুর পাড়ে নিয়ে গেলেন। দুজনেই একটা করে ডুব দিলাম। হরিজন ছোঁয়ার 'পাপ' ধুয়ে গেল।

চিরুথার জন্য বড় দুঃখ হয়েছিল। সে তো কোনো অন্যায় করে নি। কোলে নিয়ে যখন আমাকে চুমো খেয়েছিল, আমি খুব খুসি হয়েছিলাম। ও আমাকে মায়ের মতোই ভালোবাসত। বাড়ির সকলেই আমাকে ভালোবাসত, কিন্তু আমার মনে হত চিরুথাই আমাকে সব চেয়ে বেশি ভালোবাসে।

পরদিন সকালে চিরুথার কথা কাকুকে বললাম। দাদুর হাতে মার খেয়ে ও কেমন আছে জানতে ইচ্ছা করছিল। কাকু আমাকে ভাবতে মানা করলেন। বললেন, এই রকম খারাপ জিনিস পৃথিবীতে এখনো আছে, কিন্তু পৃথিবীটা খুব তাড়াতাড়ি বদলিয়ে যাচ্ছে। কাকুর কথার মানে বুঝতে পারলাম না।

একটু পরে কাকু এসে জিজ্ঞাসা করলেন, 'বেড়াতে যাবে?' আমি তো মহা খুসি। বেরিয়ে দুজনে কয়েকজন লোকের বাড়ি গেলাম। ফিরবার সময় চিরুথার বাড়ির পাশ দিয়ে এলাম।

চিরুথা বাড়িতেই ছিল। কাকু ওকে ডেকে বললেন, 'এই যে রাজা তোমার সঙ্গে দেখা করতে



এসেছে।'

চিরুথা আমাকে বলল, 'না, না, ঘরে এসো না। তা হলে আবার বিপদে পড়ব।'

কাকু বললেন, 'রাজা বলল ওকে তোমার কাছে নিয়ে আসতে। এখন তুমি যা ভালো বোঝ, তাই কর।'

চিরুথা মিনতি করে বলল, 'না, এসো না, লক্ষ্মী মাণিক, কেউ দেখবার আগেই চলে যাও।' এই বলে সে কাঁদতে লাগল।

কাকু বললেন, 'ভিতরে যাও, রাজা, ওর বড় দুঃখ। একমাত্র তুমিই ওর মন ভালো করে দিতে পার।'

চিরুথা বলল, 'না, ভিতরে এসো না। আমাকে ছুঁতে নেই। আমার ঘরে ঢোকা পাপ।'

কাকু বললেন, 'কেঁদো না, চিরুথা, রাজা চায় যে তুমি ওকে আবার চুমো খাও।' এই বলে কাকু আমাকে ঠেলে ঘরে ঢুকিয়ে দিলেন।

চিরুথা বলল, 'না, আর খাব না। আর কখনো না। আপনারা চলে যান। বড় কর্তা দেখতে পেলে আমাকে মেরেই ফেলবেন।'

আমি ঘরে ঢুকলাম। চিরুথা তখনো কাঁদছিল। ওর কান্না আমি সইতে পারছিলাম না। আমিও কাঁদতে লাগলাম।

চিরুথা আমার কান্না দেখে, চোখ মুছে একবার কাকুর দিকে, একবার আমার দিকে তাকাল। তারপর আমাকে কোলে তুলে, বুকে জড়িয়ে ধরে, বারবার চুমো খেল। আমার মনে হল আমার মা আমাকে চুমো খাচ্ছেন।

চিরুথার কাছে অল্পক্ষণই ছিলাম। ও বলল, 'যাও, সোনারচাঁদ, বড় কর্তা টের পাবার আগেই বাড়ি যাও।'

আমরা বাড়ি ফিরে এলাম। আর কখনো চিরুথার কুটিরে যাই নি, কিন্তু প্রায় রোজ ওকে দেখতে পেতাম। আমাকে দেখলেই ঐ রকম স্নেহ ভরা চোখে ও আমার দিকে চেয়ে থাকত।

ওকে দেখতে, ওর সঙ্গে কথা বলতে আমার ভালো লাগত। সব সময় মনে হত ও কেন অস্পৃশ্য হল।

●

বড় অতিথি

একবার আমাদের বাড়িতে একজন বড় অতিথি এসেছিলেন। তিনি হলেন লক্ষ্মী নামে একটি মেয়ে হাতি। আমাদের একজন বড়লোক আত্মীয় হলেন ওর মালিক। তিনি ওকে কিছুদিনের জন্য আমাদের বাড়িতে রাখতে চাইলেন। দাদুর খুব ইচ্ছা ছিল না। হাতি পোষার মেলা খরচ, হলই বা বাচ্চা হাতি। তবু আত্মীয়ের অনুরোধ রাখতেই হয়।

যেই শুনলাম লক্ষ্মী আসছে, আমার উৎসাহ দেখে কে! সবাইকে জিজ্ঞাসা করতে লাগলাম কি ভাবে ওর যত্ন করব। ঠামু বললেন, হাতিরা আখ খেতে ভালোবাসে, লক্ষ্মীর জন্য কিছু আখ রাখা দরকার।

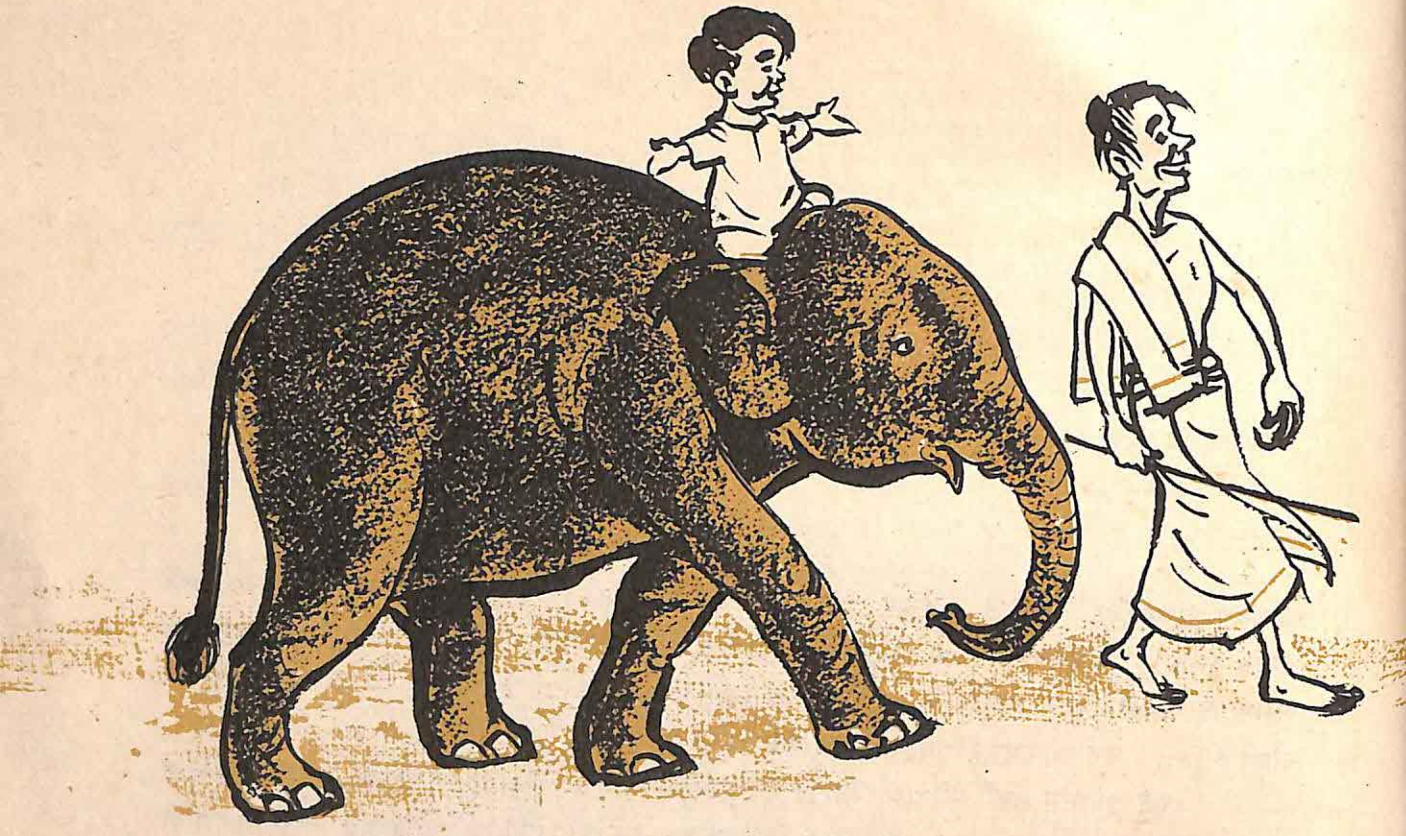
তারপর একদিন সন্ধ্যেবেলায় লক্ষ্মী এল, সঙ্গে তার মাহুত কিট্টু। লক্ষ্মীকে অভ্যর্থনা করবার জন্য বাড়ির সকলে বাইরে বেরিয়ে এল। সুন্দর হাতি, অল্প বয়স।

কিট্টু বলল, 'ওর বয়স বেশি নয়, আট পোরে নি। ভারি বুদ্ধি ওর, টপ করে সব কিছু শিখে নেয়। সবাইকে ও ভালোবাসে, সকলের সঙ্গে খেলা করতে চায়।' লক্ষ্মীর বিষয় কিট্টু এত সব ভালো ভালো কথা বলতে লাগল যে আমি ভাবলাম লক্ষ্মী বুঝি ওর নিজের মেয়ে!

আমার কাছে এক টুকরো আখ ছিল, সেটা লক্ষ্মীকে দিতে ইচ্ছা করছিল। কিন্তু কাছে যেতে ভয় করছিল। কিট্টু আমার হাতে আখ দেখে, আমাকে লক্ষ্মীর কাছে নিয়ে গিয়ে বলল, 'ও ছোট ছেলে মেয়ে ভালবাসে।' আমি লক্ষ্মীকে আখটা দিলাম, ও সেটা নিয়ে খেয়ে ফেলল।

রাতে লক্ষ্মীকে আমাদের উঠোনে একটা গাছের সঙ্গে বেঁধে রাখা হল। অনেকক্ষণ বসে বসে ওকে দেখলাম। আরো বেশিক্ষণ থাকতাম, কিন্তু ঠামু বেরিয়ে এসে বললেন, 'দেখ রাজা, এবার শুতে যাও। সকালে আবার হাতি দেখতে পারবে।'

পরদিন ভোরে উঠেই বাইরে গেলাম। লক্ষ্মী আমাকে দেখে শুঁড় নাড়তে লাগল, ঠিক যেন অভ্যর্থনা করছে।



তবু কাছে যেতে ভয় পাচ্ছিলাম। লক্ষ্মী নিজেই আমার কাছে আসার চেষ্টা করল। কিন্তু গাছের সঙ্গে শিকল দিয়ে বাঁধা বলে পারল না।

একটু বেলা হলে কিট্টু এসে লক্ষ্মীকে স্নান করাতে নিয়ে চলল। আমি কখনো হাতির স্নান দেখি নি, তাই ওদের পিছন পিছন পুকুর পাড়ে গেলাম। প্রথমে লক্ষ্মী একা পুকুরে নেমে, জলে খেলা করতে লাগল। শুঁড়ে জল পুরে, নিজের গায়ে বার কয়েক ঢালল।

তারপর কিট্টু জলে নেমে লক্ষ্মীকে বসতে বলল। লক্ষ্মী আবার শুঁড়ে জল ভরে কিট্টুর দিকে তাকাল। কিট্টু বলল, 'দিও না, দিও না, বলছি।' কিন্তু কে শোনে। লক্ষ্মী সমস্ত জলটা কিট্টুর গায়ে ছিটিয়ে দিল।

কিট্টু একটুও রাগ করল না। সে আবার লক্ষ্মীকে বসতে বলল। লক্ষ্মী আবার শুঁড়ে জল ভরল। তখন কিট্টু লাঠি দেখিয়ে লক্ষ্মীকে দুষ্টুমি করতে মানা করল। লক্ষ্মী এবার কিট্টুর গায়ে জল না দিয়ে, জলটাকে খুব জোরে পিছন দিকে ছিটিয়ে দিল।



আমি ঠিক ওর পিছনেই দাঁড়িয়ে ছিলাম, তাই জলটা আমার সারা গায়ে পড়ল। ভারি মজা লাগল। লক্ষ্মী তো শুধু খেলা করছিল।

কিট্টু ওর কান টেনে ওকে আবার বসতে বলল। এবার লক্ষ্মী কথা শুনল। তারপর এক টুকরো পাথর দিয়ে কিট্টু ওর সারা গা পরিষ্কার করে দিল।

ফিরবার পথে কিট্টু আমাকে লক্ষ্মীর পিঠে চড়াল। আমার ফুর্তি দেখে কে! বাড়ি পৌঁছে দেখি দাদু টাদু আর অন্যরা সবাই আমার হাতি চড়া দেখতে বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন।

কিট্টু আমাকে বলেছিল লক্ষ্মী আগের চেয়েও পাকা কলা বেশি ভালোবাসে। বাড়িতে অনেক কলা ছিল। কিন্তু পাকা কলা সব ভাঁড়ারে বন্ধ থাকত। একমাত্র দাদু সেগুলোকে বের করে একে ওকে দিতেন। আমি সুযোগের অপেক্ষায় রইলাম। যেই না দাদু বাড়ি থেকে বেরিয়েছেন, আমিও চুপি চুপি ভাঁড়ারে গিয়ে মস্ত এক ছড়া কলার আধখানা নিয়ে, লক্ষ্মীকে দিলাম। সে মহা আনন্দে সেগুলোকে খেয়ে ফেলল।

পরে দাদু দেখেন কলা কম।

সবাইকে জিজ্ঞাসা করে বের করলেন আমি কলা সরিয়েছি। ওঁকে না বলে কেউ কিছু নেয়, এটা দাদু পছন্দ করতেন না। লম্বা এক বেত নিয়ে আমাকে ডাকলেন। বুঝলাম পেটাবার ইচ্ছা। দিলাম টেনে দৌড়। দাদুও পিছন পিছন দৌড়লেন।

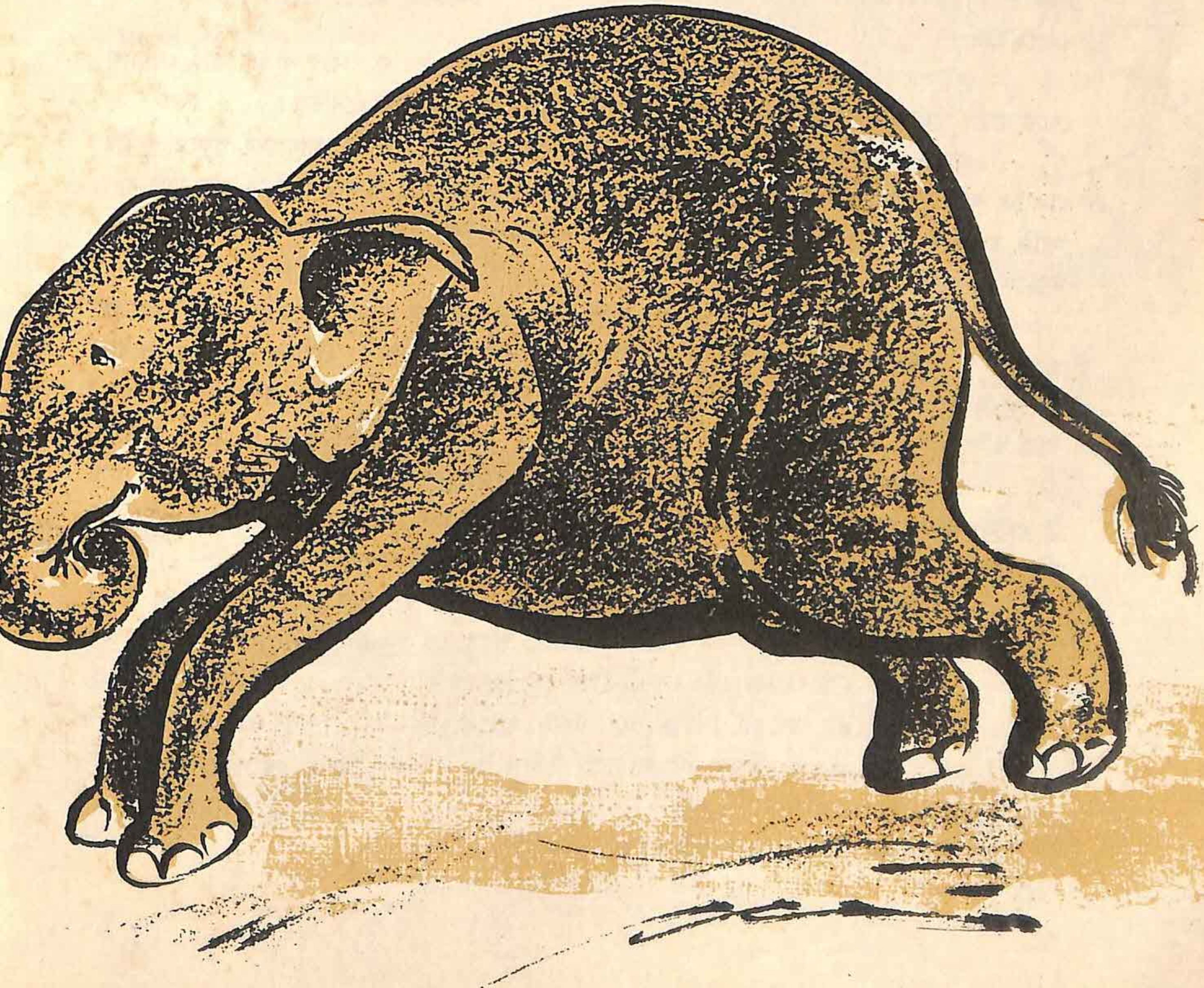
লক্ষ্মী তখন গাছে বাঁধা ছিল। সে দেখল আমি পালাচ্ছি আর দাদু আমাকে তাড়া করেছেন। তক্ষুনি সে আমার সাহায্যে এল। বিকট চিৎকার করে দাদুর দিকে তেড়ে গেল।



দাদু বেজায় ভয় পেলেন। এক দৌড়ে বাড়িতে ঢুকে দরজায় হুড়কো দিলেন। আমি লক্ষ্মীর কাছে গিয়ে ওর পিঠ চাপড়ে দিলাম।

কিছুক্ষণ পরে দাদু বেরিয়ে এলেন, হাতে কলার ছড়ার বাকি আধখানা। আমাকে বললেন ওটা নিয়ে লক্ষ্মীকে দিতে। তাই দিলাম। তখন দাদু আর লক্ষ্মী দু'জনেই মহা খুশি!

লক্ষ্মী আমাদের কাছে মোটে পনেরো দিন ছিল। ও যখন চলে গেল আমার খুব দুঃখ হল।



কুমীরের জন্য কান্না

একবার আমাদের একটা পুকুরে প্রকাণ্ড কুমীর এসেছিল। বর্ষা থেকে গ্রীষ্মকাল অবধি কুমীরটা ওখানে ছিল।

কুমীররা খাবারের খোঁজে ঘুরে বেড়ায় আর যে সব জায়গায় সহজে খাবার পাওয়া যায়, সেখানে থেকে যায়। আমাদের পুকুরে অনেক মাছ ছিল। মাছের লোভেই কুমীর এসেছিল।

প্রায়ই দেখতাম মুখ হাঁ করে কুমীরটা পুকুর পাড়ে রোদ পোয়াচ্ছে। আমাদের পুকুরে কুমীর থাকাতে আমার আপত্তি ছিল না। কিন্তু আমাদের মাছ খেয়ে ফেলাতে আমার একটুও মত ছিল না। আমি চাইতাম ও চলে যায়। নিজে যখন যাবার নাম করল না, তখন আমিই ওকে তাড়াবার ফন্দি আঁটতে লাগলাম।

ইঁট আর পাথর যোগাড় করে, পা টিপে টিপে পুকুর পাড়ে হাজির হলাম। কুমীর পাড়েই শুয়েছিল। একটা গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে গায়ের জোরে ইট ছুঁড়লাম। ইটটা ওর গায়ে লাগার আগেই ও জলে নেমে গেল, আর ওকে দেখা গেল না। কখন আবার ওঠে সেই আশায় বসে থাকলাম, কিন্তু ও আর উঠল না।

বাড়ি গেলাম ; কয়েক ঘন্টা পরে ফিরে এসে দেখি কুমীর আবার পাড়ে শুয়ে। আবার ঢিল ছুঁড়লাম, আবার পালাল ঢিলটা গায়েও লাগল না। অনেক দিন ধরে চেষ্টা করলাম, কিন্তু একবারো টিপ ঠিক হল না। তখন ভাবলাম ওটাকে জব্দ করার জন্য অন্য উপায় ঠাওরাতে হবে।

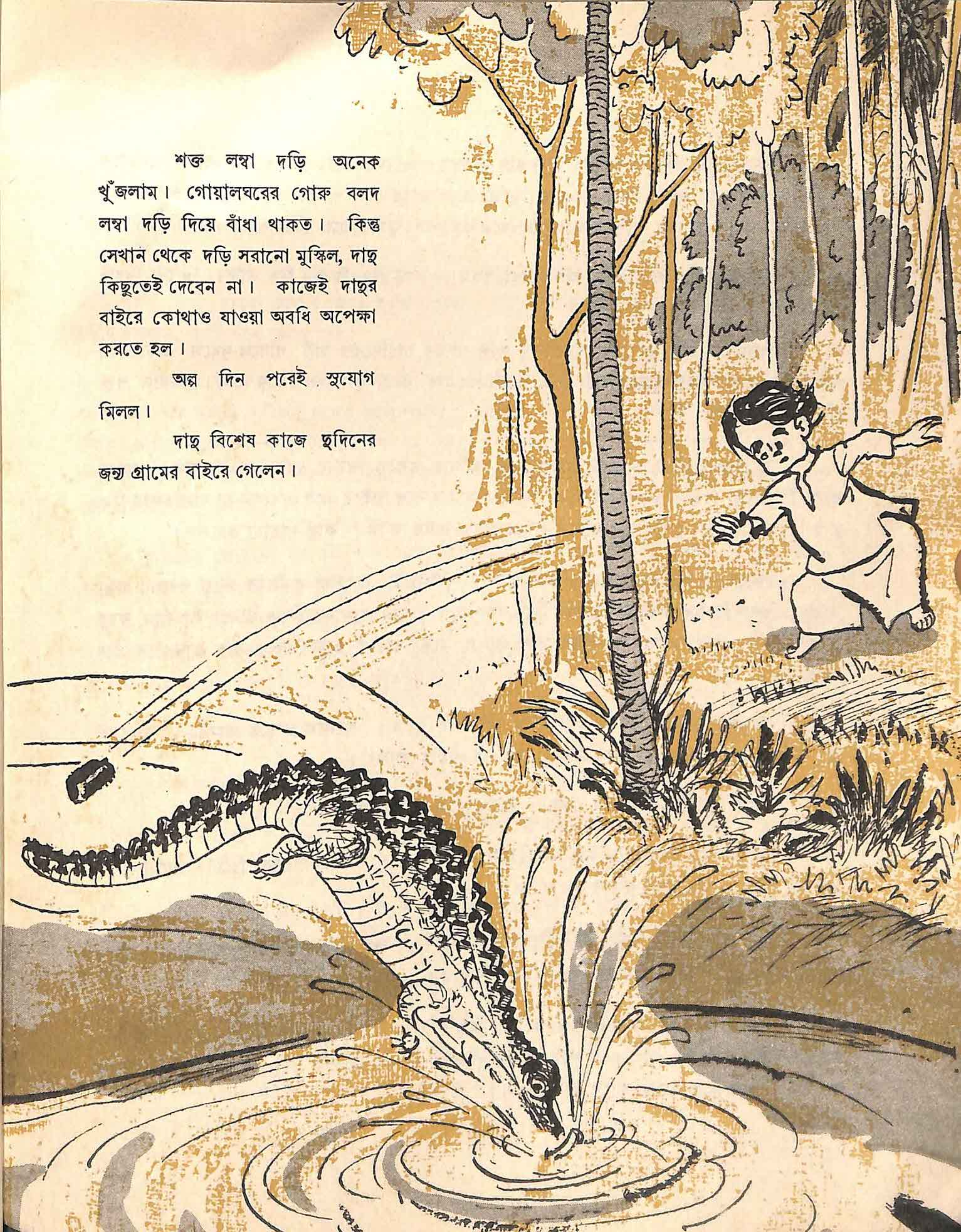
একবার ফাঁস দিয়ে নেড়ি কুত্তো ধরা দেখেছিলাম ; মনে হল ফাঁস দিয়ে কুমীরও ধরা যায়। কুমীরটা ঐ পুকুরে থাকত। রাত হলে মাছের খোঁজে এ পুকুর সে পুকুর ঘুরে বেড়াত। ডাঙ্গায় ওর পায়ের ছাপ দেখেই টের পাওয়া যেত কোথা দিয়ে কোথায় গেছে। সেই পায়ের ছাপ ধরে এগিয়ে দেখি পুকুরের চারদিকের ঝোপের বেড়ার মধ্যে দিয়ে যাবার জন্য এক জায়গায় কুমীরটা একটা গর্ত বানিয়ে রেখেছে। ভাবলাম এই হল ফাঁস লাগাবার ঠিক জায়গা। কুমীর নিশ্চয় এই পথেই যাবে আর অমনি ফাঁসে আটকাবে।

এখন একটা লম্বা দড়ি পেলেই হয়।

শক্ত লম্বা দড়ি অনেক খুঁজলাম। গোয়ালঘরের গোরু বলদ লম্বা দড়ি দিয়ে বাঁধা থাকত। কিন্তু সেখান থেকে দড়ি সরানো মুস্কিল, দাদু কিছুতেই দেবেন না। কাজেই দাদুর বাইরে কোথাও যাওয়া অবধি অপেক্ষা করতে হল।

অল্প দিন পরেই সুযোগ মিলল।

দাদু বিশেষ কাজে দুদিনের জন্য গ্রামের বাইরে গেলেন।



সন্ধ্যাবেলায় গোয়াল ঘরে গিয়ে একটা গোরুর গলা থেকে দড়িগাছা খুলে নিলাম। সেটাকে নিয়ে ঝোপের বেড়ার গর্তের কাছে গেলাম। দড়ির এক মাথায় ফাঁস পরিয়ে অন্য মাথা গাছে বাঁধলাম। ব্যস্, ফাঁদ তৈরি! তারপর বাড়ি চলে গেলাম, মনে বড় আশা কুমীর এসে ফাঁদে পড়বে।

পরদিন ভোরে উঠে দৌড়ে গেলাম ঝোপের ধারে। যা ভেবেছিলাম ঠিক তাই। ঐ তো বিরাট কুমীরটা, গলায় ফাঁস আঁটা!

পালাবার জন্য খুব চেষ্টা করেছিল, তাই গাছের চারদিকের মাটি খাবলে-খুবলে একাকার! আমাকে দেখতে পেয়েই, হঠাৎ মুখ হাঁ করে, বিকট চিৎকার করে, কুমীরটা তেড়ে এল। অমনি শক্ত দড়িতে বাধা পেল।

ছুটে বাড়ি গিয়ে, কাকুকে ডেকে তুলে, আমার প্রকাণ্ড শিকার ধরার কথা বললাম। প্রথমে কাকু কিছুতেই বিশ্বাস করছিলেন না। তারপর আমার সঙ্গে বাইরে এসে দেখলেন যা বলেছিলাম ঠিক তাই। আমার ইচ্ছা কুমীরটাকে সরিয়ে বাড়ির আরো কাছে আনি। কাকু সাহায্য করলেন।

আরেকটা দড়ি এনে তাতেও ফাঁস লাগিয়ে, লম্বা লাঠির সাহায্যে কুমীরের গায়ে পরানো হল। তারপর বিশাল জানোয়ারটাকে টেনে নিয়ে চললাম। আমি সামনের দিকে টানতে লাগলাম, কাকু পিছন দিকটা ধরে রইলেন। বাড়ির বেশ কাছে এনে, ওটাকে দুটো গাছের সঙ্গে টান করে বেঁধে ফেলা হল।

ততক্ষণে আমার মস্ত শিকার ধরার কথা রটে গেছে। অনেকে দেখতে এসেছে। প্রথমেই ঠামু বেরিয়ে এলেন, তারপর বাড়ির চাকররা, তারপর পাড়ার লোকরা।

খবরটা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। ক্রমে আরো অনেক লোক আসতে লাগল।

সেদিন আর স্কুলে যেতে ইচ্ছা করছিল না। ছুটি চেয়ে মাস্টারমশাইকে চিঠি পাঠানো হল। কত বড় কুমীর ধরেছি, সে খবরও জানানো হল।

আমাদের একজন চাকর চিঠি নিয়ে স্কুলে গেল। সে যখন ফিরল, কুমীর দেখতে সঙ্গে এলেন মাস্টার মশাই ও ক্লাস সুদ্ধ ছেলে, ত্রিশজনেরো বেশি হবে।

আমার মনে হচ্ছিল আমি মস্ত বাহাদুর, অন্ততঃ ক্লাসের ছেলেদের কাছে তো বটেই। তাদের কাছে কুমীরের কথা, কি করে ওকে ধরলাম, সব বললাম। মাস্টারমশাই কুমীরের বিষয়ে অনেক কিছু বললেন। এত কথা আমরা আগে জানতাম না।

ভিড় আরো বাড়ল। তার মধ্যে কয়েকজনের কুমীরটাকে মারার ইচ্ছা। তারা ওর দিকে ঢিল আর লাঠি ছুঁড়তে লাগল। আমার সেটা ভালো লাগল না। আমি বললাম কুমীরটা আমার, তার অনিষ্ট করার ওদের কোনো অধিকার নেই। কিন্তু কে শোনে সে কথা!

দেখতে দেখতে ভিড় আরো বেড়ে গেল। অনেকেই কুমীরের গায়ে ঢিল মারছিল। শুনলাম কেউ কেউ ওকে মেরে ফেলার কথা পর্যন্ত বলছে। কত করে বললাম ওকে যেন কেউ কষ্ট না দেয়। শেষে বললাম, আমি ওকে ছেড়ে দেব।

অনেকে তাতে চটে গেল। তারা বলতে লাগল, হিংস্র কুমীর ছেড়ে দেওয়া সাংঘাতিক ব্যাপার। কেউ বলল, এর মধ্যেই কুমীরটা অনেক ক্ষতি করেছে, কাজেই ওকে মেরে ফেলাই উচিত। একজন লোক এগিয়ে এসে বলল, কুমীরটা নাকি ওর কুকুর মেরে খেয়েছে। আরেকজন বলল, ও নাকি তার গোরুকে তেড়ে গিয়েছিল। একজন মহিলা বললেন, 'ঐ কুমীরটাই তো একদিন রাত্রে আমাকে মেরে ফেলবার জন্য পিছু নিয়েছিল।'

ভিড়ের লোকদের সে কি রাগ আর অ-ধৈর্য। কারো হাতে লাঠি ছোরা, কারো হাতে কুড়ুল। সবার ইচ্ছা আমার কুমীরকে মেরে ফেলা হয়। একলা আমার কিছুই করার উপায় ছিল না। কাকুকে ডাকতে লাগলাম। কিন্তু তাঁকেও কোথাও দেখলাম না। হয়তো তিনি ভিড়ের মধ্যেই ছিলেন। ঠামুকে ডাকতেই ঠামু এলেন। কিন্তু লোকরা কি বলছে তিনি শুনেছিলেন। তিনিও বললেন ওটাকে মেরে ফেলাই সব চেয়ে ভালো।

আমি নিরাশ হয়ে পড়লাম।

এমন সময় দাদু ফিরে এলেন।


আমি জানতাম দাদু ছাড়া কেউ আমার কুমীরকে বাঁচাতে পারবে না। ছুটে গিয়ে তাঁকে বললাম, কি ব্যাপার। কুমীরটাকে বাঁচাবার জন্য অনুনয় করতে লাগলাম।

যেখানে কুমীরটা গাছে বাঁধা ছিল, আমার সঙ্গে দাদু সেখানে এলেন। বিশাল বন্দীর দিকে একবার তাকালেন, ভিড়ের দিকে একবার তাকালেন। তারপর চেঁচিয়ে বললেন, কুমীরটাকে ছেড়ে দেওয়া হবে, কেউ ওর অনিষ্ট করতে পাবে না।

আনন্দে লাফিয়ে উঠলাম। কিন্তু দাদুর কথা ভিড়ের লোকদের ভালো লাগল না। কেউ কেউ তাঁর সঙ্গে তর্ক করতে চাইছিল। দাদু তর্ক শোনার মানুষই ছিলেন না। চিৎকার করে তাদের ওখান থেকে চলে যেতে বললেন। ভিড় ফাঁকা হয়ে গেল।

তারপর দাদু আমার দিকে ফিরে বললেন, 'কুমীরটাকে এক্ষুনি ছেড়ে দে।' যাক্, কুমীরের প্রাণ বাঁচল। হঠাৎ দারুণ ভয় হল; কুমীরটাকে ছাড়ব কি করে?

ঠিক সেই সময়ে কাকু এলেন। তিনি আমাকে সাহায্য করবেন বললেন। আমাদের বাড়ি থেকে কিছু দূরে একটা মন্দিরে মস্ত পুকুর ছিল। সেখানে অনেক কুমীর থাকত। কাকু বললেন, ঐ পুকুরে কুমীরটাকে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে এলে হয়।



ঐ পুকুরধারে কাকু একটা লম্বা মই আনালেন। তারপর কুমীরটাকে সেখানে নিয়ে গেলাম। দাছও সঙ্গে এলেন, যাতে কেউ ওর কোনো অনিষ্ট না করে।

পুকুরধারে পেঁাছে, কুমীরটাকে জলের কাছে ধরে রেখে, ওর গায়ের উপরে মই চাপানো হল। মইয়ের ছুই মাথা আটজন করে লোক চেপে রাখল, যাতে কুমীরটা নড়তে চড়তে না পারে।

তারপর কাকু এগিয়ে গিয়ে, ছুরি দিয়ে ওর গায়ে বাঁধা দড়ি কেটে দিলেন। কাকু সরে এলে, মইটা তুলে ফেলা হল আর কুমীরও এক লাফে পুকুরের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। আমরাও নিশ্চিন্ত মনে বাড়ি ফিরে এলাম।

এর দিন কতক পরে দেখলাম ধরা পড়ার আগে যেখানে কুমীরটা থাকত, ঠিক সেইখানে, আমাদের পুকুরপাড়ে, আবার সে রোদ পোয়াচ্ছে!





স্কুলের কথা

আমাদের স্কুলের হেডমাস্টার মশাই বেজায় মোটা ছিলেন। তার উপরে বেঁটে। এতই মোটা বেঁটে ছিলেন যে চলে ফিরে বেড়ালে মনে হত একটা বল্ গড়াচ্ছে। আমরা, স্কুলের ছেলেরা, ওঁর পিছনে ওঁকে নিয়ে হাসাহাসি করতাম। কিন্তু সামনে থাকতাম যেন বেড়ালের মুখের কাছে নেংটি ইঁদুর। সর্বদাই উনি হাঁড়ি মুখ করে থাকতেন ; স্কুলে কখনো হাসতেন না। ছেলেদের কড়া নিয়মের মধ্যে রাখতে চাইতেন। তাই সুবিধা পেলেই বেত চালাতেন।

হেডমাস্টার মশাই এদিকে দাদুর বন্ধু। মাঝে মাঝে দাদুর সঙ্গে দেখা করতে আমাদের বাড়িতে আসতেন। আমি স্কুলে কি করি না করি, সে খবরও দিয়ে যেতেন। স্কুলে কখনো আমার দিকে বেশি নজর দিতেন না ; তবু বলতেন আমি নাকি স্কুলের সেরা ছেলেদের একজন, আমার সামনে নাকি উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ, এই সব। দাদুও তাই শুনে মহা খুসি, তাঁর ইচ্ছা হেডমাস্টার মশাই বারবার ঐ কথাই বলেন। হেডমাস্টারও খুসি হয়েই তাই বলতেন।

একদিন কিন্তু হেডমাস্টার দাদুকে বললেন যে বড়ই দুঃখের বিষয় আমি পড়াশুনোর অযত্ন করছি। দাদুর উচিত আমার উপর আরেকটু নজর রাখা।

হেডমাস্টার চলে গেলেই দাদু সত্যিই আরেকটু নজর রাখলেন। একটা বেত নিয়ে আমার ঘরে এলেন। আমি রঙ দিয়ে ছবি আঁকছিলাম। দাদু সিংহের মতো আমার উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে, আমার হাতের কব্জি ধরে পেটাতে শুরু করে দিলেন।

আমিও চেঁচিয়ে কেঁদে ঠামুকে ডাকতে লাগলাম, 'ও ঠামু, শীগ্‌গির এসো, আমাকে বাঁচাও!'

ঠামু ছুটে এসে আমার আর দাদুর মাঝখানে পড়লেন। চিৎকার করে বললেন, 'করছ কি? ছেলেটাকে যে মেরেই ফেলবে!'

দাদু আমাকে ছেড়ে দিলেন বটে, কিন্তু ঠামুর দিকে ফিরে চ্যাঁচাতে লাগলেন, 'তুমিই ওর মাথাটি খাচ্ছ! কিচ্ছু পড়াশুনো করে না, কেবল ছবি আঁকে।'

তারপর ঘরের চারদিকে চেয়ে দেখেন দেয়ালে আঁটা আমার আঁকা কত রঙিন ছবি, সাদা কালো ছবি। দারুণ রেগে, যতগুলো পারলেন দাদু ছিঁড়ে ফেলে দিলেন।



তারপর আমাকে সাবধান করে দিলেন, খবরদার যেন ছবি এঁকে সময় নষ্ট না করি। এই বলে দাদু বেরিয়ে গেলেন।

অমন ভালো ভালো রঙিন ছবি নষ্ট হল বলে আমার সে কি দুঃখ! তার উপরে বাড়িতে বসে আর ছবি আঁকতেও ভয় করছিল।

এরপর একদিন হেডমাস্টার মশাই আমাদের অঙ্কের ক্লাস নিতে এলেন। অঙ্কের মাস্টার ছুটি নিয়েছিলেন, হেডমাস্টারের ইচ্ছা নয় যে ঐ সময়টা নষ্ট হয়। হেডমাস্টার মশাইয়ের ক্লাস আমাদের ভালো লাগত না!



কিন্তু কিছু করারও জো ছিল না। উনি ঘরে ঢুকতেই আমরা চুপ করে উঠে দাঁড়ালাম। উনি চারদিকে চেয়ে দেখলেন সব ঠিক আছে কি না। তারপর বাঁ হাত নেড়ে আমাদের বসতে বললেন। আমরা তাই করলাম।

হেডমাস্টার তখন ব্ল্যাক-বোর্ডে গিয়ে, একটা কাগজ থেকে পাঁচটা অঙ্ক লিখে দিলেন। তারপর আমাদের দিকে ফিরে বললেন, 'এই যে পাঁচটি অঙ্ক দিলাম, আমি চাই ক্লাস শেষ হবার আগে সবগুলো তোমরা কষে ফেল।'

এই বলে আবার তাকিয়ে দেখলেন সবাই ওঁর কথা বুঝতে পারল কি না। তারপর চেয়ারে বসে, মাথার পাগড়ি খুলে টেবিলে রাখলেন। বোঝা গেল খুব ক্লান্ত। এর পর পা দুটোকেও টেবিলে তুলে, হেডমাস্টার একটু বিশ্রাম করতে লাগলেন। দেখতে দেখতে ঘুমিয়েই পড়লেন।

অঙ্কগুলো খুব সহজ, কয়েক মিনিটের মধ্যেই সব ছেলেরা সেগুলো কষে ফেলল।

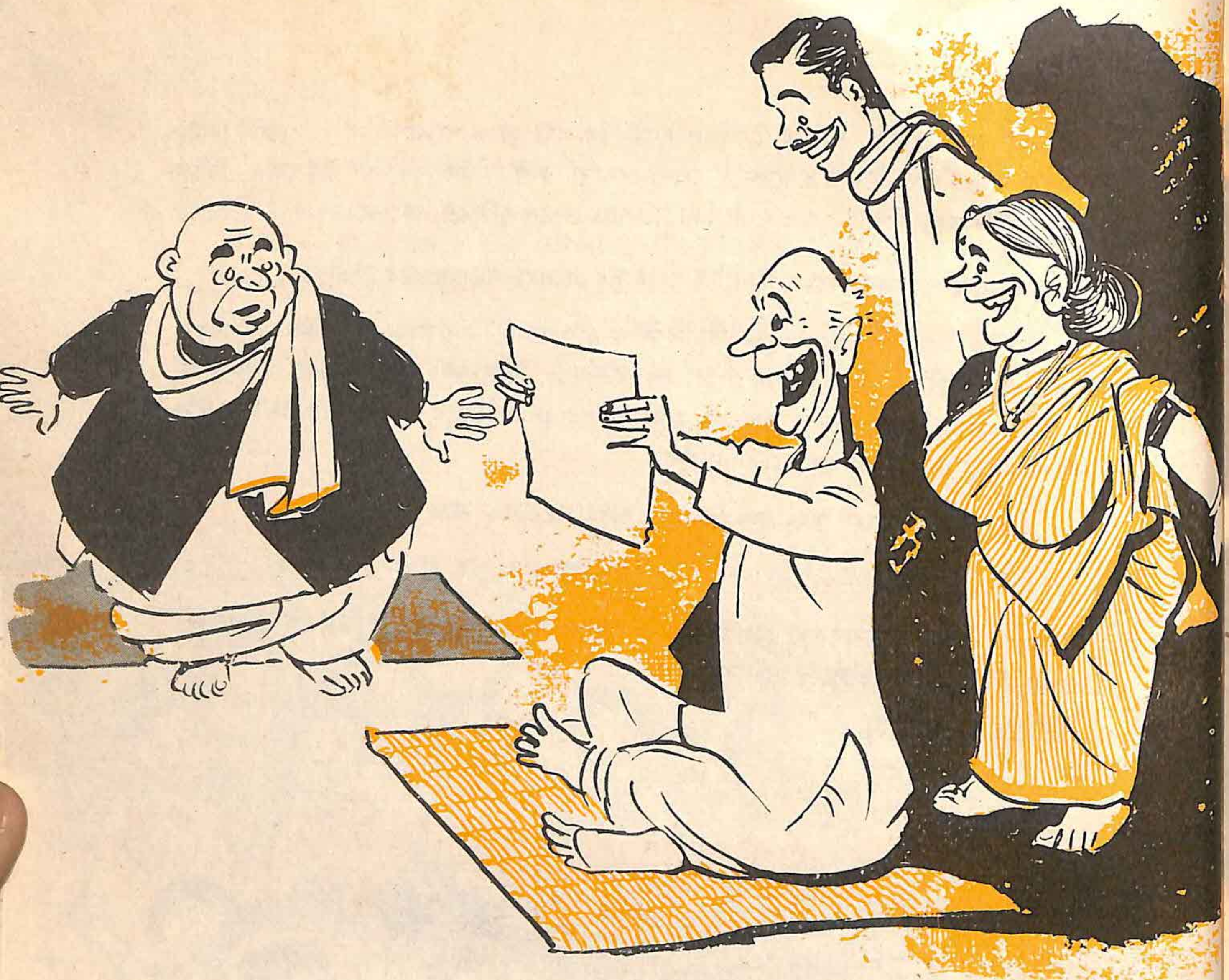
আমিও অঙ্ক শেষ করে হেডমাস্টারের দিকে তাকালাম। এত মজার দেখাচ্ছিল যে ভাবলাম একটা ছবি এঁকে ফেলি। তাই করলাম; খাসা হল ছবিটা। গোল মুখ, টেকো মাথা, মস্ত ভুঁড়ি, পায়ের উপর কাপড় নেই বললেই হয়, যে অদ্ভুত ভঙ্গিতে ঘুম দিচ্ছিলেন, সমস্তই আঁকলাম। ছবিটা অবিকল ওঁর মতো হয়েছিল, দেখলেই চেনা যাচ্ছিল।

আমার মহা উত্তেজনা, কখন ক্লাস শেষ হবে, ছবিটা বন্ধুদের দেখাতে পারব!

ঘণ্টা পড়ল, হেডমাস্টারের ঘুমও ভাঙল। উঠে, আমাদের অঙ্ক দেখে, চলে গেলেন।

তখন বন্ধুদের সামনে ছবিটা তুলে ধরলাম। তাদের সে কি অট্টহাসি! পরের ক্লাসের মাস্টার-মশাই যখন এলেন, তখনো ছেলেদের মধ্যে মহা চাঞ্চল্য।





খানিকক্ষণ মাস্টারমশাই ছেলেদের সামলাতে চেষ্টা করলেন; কোনো ফল হল না। তখন আমার কাছে এসে আমার হাত থেকে ছবিটা ছিনিয়ে নিলেন। ছবিটার দিকে তাকিয়ে একবার একটু মুচকি হাসলেন, তারপর মুখটাকে গম্ভীর করে ক্লাস থেকে বেরিয়ে গেলেন। কয়েক মিনিট পরে ফিরে এসে, আমাকে হেডমাস্টারের সঙ্গে দেখা করতে বললেন।

হেডমাস্টারের ঘরে গিয়ে দেখি টেবিলের উপর আমার ছবিটা! হেডমাস্টার বেজায় চটে গেছেন। আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'এটা তুমি এঁকেছ?'

আমি বললাম, 'হ্যাঁ।'

'তুমি এঁকেছ ?' হেডমাস্টার গর্জন করে উঠে, আমার হাত চেপে ধরে দু ঘা বেত লাগালেন। তারপর আবার বললেন, 'বটে, তুমি এঁকেছ! দু সপ্তাহ ক্লাসে ঢুকতে পাবে না। এখুনি বেরোও এখান থেকে!'

বেরিয়ে গেলাম। কি যে করা যায় ভেবে পেলাম না। তক্ষুণি বাড়ি গিয়ে দাদুর সামনেও পড়া যায় না। টিফিনের ছুটি অবধি ক্লাসের বাইরে বসে রইলাম।

হেডমাস্টারের ছবি আঁকার জন্য আমি শাস্তি পেয়েছি, এ খবর স্কুলময় রটে গেল। টিফিনের ছুটিতে ছেলেদের মধ্যে অনেকে আমার কাছে ছুটে এল। কেউ কেউ সহানুভূতি জানাল। কেউ বলল, হেডমাস্টারের বিরুদ্ধে একটা কিছু করা উচিত। একজন বলল, ওঁর চেয়ারের তলায় পটকা ফাটানো উচিত। একজন বলল, ওঁর ঘরের দরজার মাথায় কালির শিশি বসানো উচিত। কেউ কেউ ধর্মঘট করার কথা পর্যন্ত বলল। তারপর দুপুরের খাওয়ার জন্য আমাকে বাড়ি যেতে হল।

ঠামু খাবার দিচ্ছেন, এমন সময় হেডমাস্টার মশাই দাদুর সঙ্গে দেখা করতে এলেন। দরজার পিছনে লুকিয়ে ওঁদের কথা শুনতে লাগলাম। হেডমাস্টার বললেন, আমি নাকি ক্লাসে ভালো করে পড়াশুনো করি না। একটা গোটা ঘণ্টা ওঁর ছবি এঁকে নষ্ট করেছি। এই বলে দাদুকে আমার আঁকা ছবিটা দিলেন।

দাদু ছবিটা দেখেই হো হো করে হেসে উঠলেন। বললেন, 'রাজা এঁকেছে নাকি ?'
হেডমাস্টার বললেন, 'হ্যাঁ।'
দাদু আবার হাসতে লাগলেন। তারপর ঠামুকে আর কাকুকে ছবি দেখতে ডাকলেন।
দাদু বললেন, 'আপনার কি মনে হয় ছবিটা এঁকে রাজা অন্যায় করেছে ?'
হেডমাস্টার বললেন, 'নিশ্চয়ই। আমি যখন পড়াচ্ছিলাম, সেই সময় এঁকেছে।'
দাদু বললেন, 'আমার কিন্তু ছবিটা বড্ড ভালো লাগছে। ছেলেটার এত বুদ্ধি তা তো জানতাম না।'

হেডমাস্টার কয়েক মিনিট চুপ করে থেকে হেসে বললেন, 'হ্যাঁ, খুব বুদ্ধি। তাই তো ছবিটা আপনার কাছে নিয়ে এলাম।'

আমি কিন্তু ভেবেই পেলাম না হেডমাস্টার কেন সুর বদলালেন।



ভাগ্যের খেলা

আমাদের বড় মন্দিরে প্রত্যেক বর্ষায় উৎসব হত। এই উৎসবের প্রধান অনুষ্ঠান ছিল নকল যুদ্ধ। মন্দিরের পূর্ব দিকে যারা থাকত, তাদের সঙ্গে পশ্চিম দিকের লোকদের যুদ্ধ হত।

মস্ত একটা মাঠের ছদিকে ঢাল তলোয়ার নিয়ে শত শত লোক জড়ো হত। যেই সঙ্কেত দেওয়া হত, অমনি তারা পরস্পরের দিকে এগিয়ে যুদ্ধ আরম্ভ করে দিত।

এই রকম নকল যুদ্ধে কেউ মরেও যেত না, কারো লাগতও না। অনেক শো বছর আগে ছুইজন সত্যিকার রাজার মধ্যে সত্যিকার যুদ্ধের কথা মনে করেই, এই রকম নকল যুদ্ধের জন্য লোকদের তৈরি করা হত।

উৎসবের সময় খুব বড় মেলা বসত। অনেক দিন ধরে এই মেলা চলত। দেশের নানান্ জায়গা থেকে ব্যবসাদাররা আসত।

সঙ্গে আনত বিক্রির জন্য নানা রকম জিনিসপত্র। শত শত দোকানঘর তৈরি হত, বাজার বসে যেত। সারা বছরের কেনাকাটা করবে বলে লোকে মেলার জন্য অপেক্ষা করে থাকত। ছোট্ট একটা আলপিন থেকে প্রকাণ্ড হাতি পর্যন্ত মেলায় সব কিছু কিনতে পাওয়া যেত।

আমার খুব ইচ্ছা মেলায় গিয়ে একটা ছাতা কিনি। দাদু দুটো টাকা দিলেন। কাকুকে বললাম আমাকে মেলায় নিয়ে যেতে।

কাকু বললেন, 'মোটে দুটো টাকা নিয়ে মেলায় যাবি কি রে! দু টাকা দিয়ে করবি কি? কত জিনিস আছে সেখানে, দেখলেই কিনতে ইচ্ছা করবে।'

ঠামু তাই শুনে যা-খুসি কিনবার জন্য আমাকে আরো দুটো টাকা দিলেন।

কাকু মেলায় নিয়ে গেলেন, আমাদের চাকর নান্নু সঙ্গে গেল।

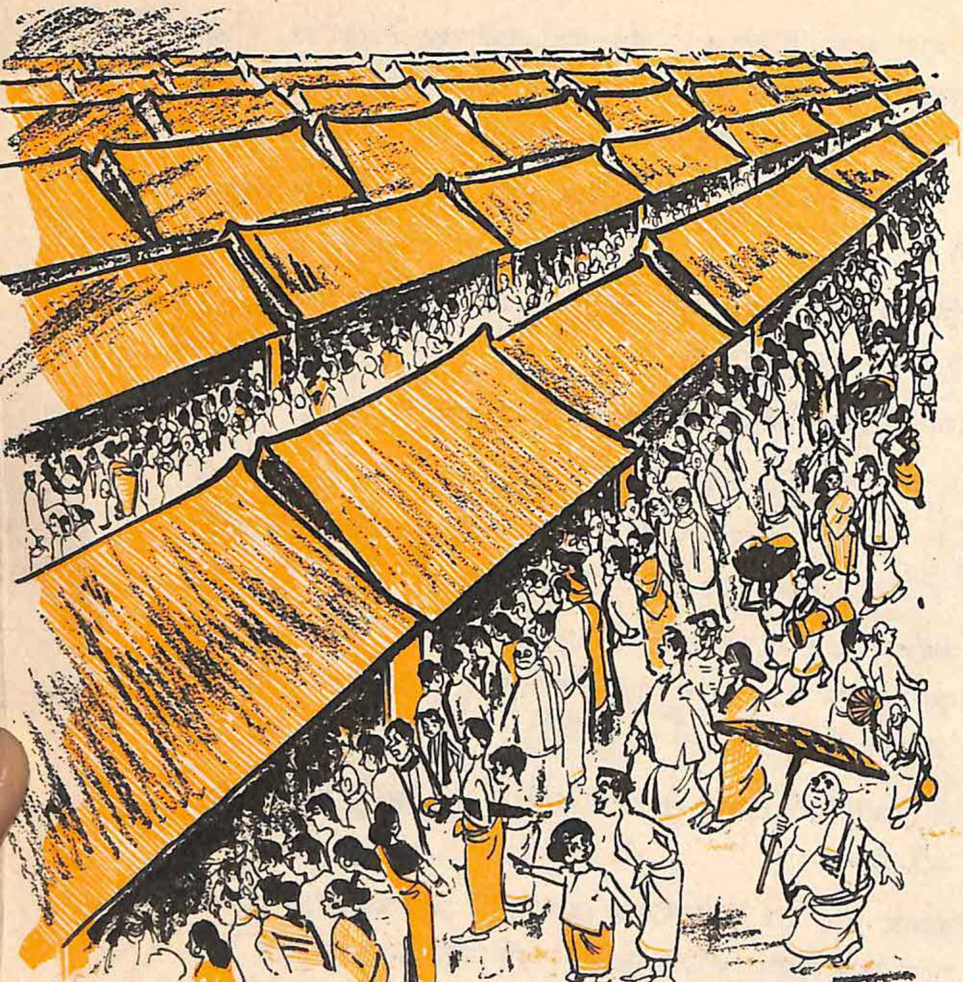
মেলায় বেজায় ভিড়। কাকু পথ করে আমাদের নিয়ে চললেন। এক জায়গায় তাঁর কয়েকটি বন্ধুর সঙ্গে দেখা হল। তাঁরা কাকুকে বললেন তাঁদের সঙ্গে একটু থাকতে।

কাকু আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তিনি ফিরে আসা পর্যন্ত নান্নুর সঙ্গে মেলায় ঘুরতে চাই কি না। আমি খুব রাজি। কাকু আমাকে সাবধান করে দিলেন, তিনি না আসা পর্যন্ত যেন কোনো জিনিস না কিনি। আমি বললাম তাঁর জন্য অপেক্ষা করব।

তারপর নান্নু আর আমি এ-দোকান সে-দোকান ঘুরতে লাগলাম। কত জিনিস কিনতে ইচ্ছা করছিল, কিন্তু কাকুর জন্য অপেক্ষা করে রইলাম।

তারপর একটা দোকানে এলাম, তার নাম 'সৌভাগ্যের দোকান।' দোকানদারটিকে ভালো লোক মনে হল। সে সবাইকে ডেকে ভাগ্যপরীক্ষা করতে বলছিল। কি করে ভাগ্যবান হতে হয়, তাও বুঝিয়ে দিচ্ছিল।

সে বলল, 'ব্যাপারটা খুব সহজ। ছত্রিশটা প্রাইজ আছে, তাদের নম্বর এক থেকে ছত্রিশ। তেমনি ছত্রিশটা চাকতি আছে, তাদের নম্বর এক থেকে ছয়। ছয়টা করে চাকতির একই নম্বর। চাকতিগুলোকে উপুড় করে, নম্বরটা নিচে চাপা রেখে, টেবিলে সাজানো হয়েছে। কিছুই করতে হয় না; আট আনা দিয়ে ইচ্ছা মতো ছয়টা চাকতি তুলে নিতে হয়। তারপর চাকতির নম্বরগুলো যোগ করতে হয়। ব্যস্, যে জিনিসের নম্বর ঐ যোগফলের সমান হবে, সেটি-ই আপনার প্রাইজ।' লোকটা আরো বলল, 'কেউ নিরাশ হবেন না। সবাই কিছু না কিছু পাবেন। প্রাইজগুলোর দাম এক সিকি থেকে পঞ্চাশ টাকার মধ্যে। কপাল যদি ভালো হয়, তা হলে দামী জিনিস পেয়ে যাবেন। সবই ভাগ্যের খেলা। আসুন ভাগ্য পরীক্ষা করে যান।'



একজন বুড়ো একটা আধুলি দিয়ে ছয়টা চাকতি তুলে নিল। তাদের নম্বর জুড়ে হল নয়। ওকে নয় নম্বরের জিনিস দেওয়া হল। চমৎকার একটা ঘড়ি। কিন্তু বুড়ো ঘড়ি নিল না। দোকানদার দয়া করে চার টাকা দিয়ে ঘড়িটা কিনে নিল। বুড়ো খুসি হয়ে চলে গেল।

তারপর আমার চেয়ে একটু বড় একটা ছেলে তার ভাগ্য পরীক্ষা করল। সে-ও আধুলি দিয়ে ছয়টা চাকতি তুলে নিল। নম্বর যোগ করে হল পনেরো। ঐ নম্বরের জিনিসটা ছিল চার আনা দামের একটা চিরুণী। দোকানদার সত্যি দয়ালু, চার আনা দিয়ে সেটা কিনে নিল। ছেলেটা আবার চেষ্টা করল। এবার তিন টাকা দামের একটা ফাউন্টেনপেন পেল। তৃতীয়বার চেষ্টা করে দশ টাকা দামের একটা হাত-ঘড়ি পেয়ে গেল। চতুর্থ বারে একটা টেবিল ল্যাম্প পেল, তার দাম চল্লিশ টাকারো বেশি। মহা খুসি হয়ে হাসতে হাসতে ছেলেটা চলে গেল।

আমারো ভাগ্য পরীক্ষা করতে ইচ্ছা করছিল। নান্নুর দিকে তাকালাম, সে খুব উৎসাহ দিল।

আট আনা দিয়ে ছয়টা চাকতি তুলে নিলাম। আমার কপালটা খুব ভালো ছিল না। ছুটো পেনসিল পেলাম। দোকানদার চার আনা দিয়ে সে ছুটোকে কিনে নিল। আবার চেষ্টা করলাম। এবার এক শিশি কালি পেলাম, খুব কম দামের। সেটাও দোকানদার চার আনা দিয়ে কিনে নিল। তৃতীয়বার চেষ্টা করলাম, তবু কপাল খুলল না।

মনে আশা বড় একটা দাঁও মারব, তাই বারবার চেষ্টা করতে লাগলাম। প্রত্যেকবার আট আনা খরচ হল আর প্রত্যেকবার একটা করে বাজে জিনিস পেলাম।

শেষটা হাতে শুধু চার আনা পয়সা বাকি রইল। আবার দোকানদারের দয়া হল। সে বলল, ঐ চার আনা দিয়েই আরেকবার খেলতে পারি। পুরস্কার পেলে না হয় তার পাওনা মিটিয়ে দেব।



আবার খেললাম। শেষ চার আনাও গেল।

সবাই আমার দিকে তাকিয়েছিল। কেউ কেউ আমার মন্দ কপাল দেখে হাসছিল। কেউ এতটুকু সহানুভূতি দেখাল না। যেখানে কাকু আমাদের অপেক্ষা করতে বলে গিয়েছিলেন, নান্নু আর আমি সেখানে গেলাম।

একটু পরেই কাকু এলেন। আমাকে দেখেই বললেন, 'রাজা, তোকে ওরকম দেখাচ্ছে কেন ? কি হয়েছে ?' আমি কিছু বললাম না ; নান্নুই সব কথা বলে দিল। প্রথমে কাকু রেগে গেলেন, তারপর হেসে আমার পিঠ চাপড়ে দিলেন ! তারপর একটা দোকানে নিয়ে গিয়ে চমৎকার একটা ছাতা, বিস্কুট, মিষ্টি আর ছোট ছোট কয়েকটা উপহার কিনে দিলেন। তারপর আমরা বাড়ি ফিরে এলাম।

বাড়ি এসে কাকু বললেন, দোকানদারটা আমাকে ঠকিয়েছিল। আমি বললাম, 'না কাকু, আমার ভাগ্যটাই খারাপ।' কাকু বললেন, 'না রে, এর মধ্যে ভাগ্য-টাগ্যর কথাই নেই।' আমি বললাম, 'কিন্তু কাকু, আমি যে দেখলাম একটা বুড়ো ঘড়ি পেল, একটা ছেলে দু-তিনটে দামী জিনিস পেল।'

কাকু বললেন, 'তুই জানিস্ নে বেটা, ওরা সবাই দোকানদারের লোক। তোকে লোভ দেখাবার জন্য ওরকম চালাকি করল। তোর টাকাগুলোতে ওদের নজর ছিল, সেগুলো গাপ্ করেও ফেলল। এবার ওসব কথা ভুলে যা। আর দেখিস্ যেন তোর মন্দ কপাল আর বোকামির গল্প কারো কাছে বলে বেড়াস না।'

●



রানীর বিপদ

একবার পিসিমার বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছিলাম। বাগানে দেখি একটা কুকুর একটা কাঠবেড়ালিকে তাড়া করছে। কিন্তু কুকুরটা ওর নাগাল পাবার আগেই আমি দৌড়ে গিয়ে কাঠবেড়ালিটাকে তুলে নিলাম। ছোট্ট বাচ্চা, ভয়ের চোটে সারা গা থরথর করে কাঁপছে। বাচ্চাটাকে আমার বড় ভালো লাগল, তাই ওটাকে বাড়ি নিয়ে গেলাম।

বাড়িতে কাঠবেড়ালি পোষা ঠামুর পছন্দ নয়। ওঁর ইচ্ছা ওটাকে ছেড়ে দেওয়া হয়। বললেন, 'বড্ড ছোট যে, রুগ্ন, দুদিনেই মরে যাবে।'

আমি বললাম, 'হ্যাঁ, ছোটই তো, রুগ্নও। তাই ওর যত্ন দরকার। আমি ওকে পুষব, ওর দেখাশুনো করব।'

পিছন থেকে দাদুর গলা শোনা গেল, 'কেনই বা ওটাকে রাখতে চাস্? জানিস্, বাচ্চা নিয়ে চলে এসেছিস্ বলে ওর বাবা-মা কত কাঁদছে!'

আমি বললাম, 'কিন্তু দাদু, আমি যে ওকে পিসির বাড়িতে একটা কুকুরের কাছ থেকে বাঁচিয়েছি।



ওকে ওখানে কি করে রেখে আসি ? কুকুরটা যে ওকে মেরে ফেলবে।'

দাদু কাঠবেড়ালিটার দিকে একবার তাকিয়ে, কিছু না বলে চলে গেলেন। বুঝলাম কাঠবেড়ালি পোষার অনুমতি পাওয়া গেছে। এবার ঠামুরো আপত্তির কারণ রইল না। ছোট্ট কাঠ-বেড়ালিটার গায়ে হাত বুলিয়ে দিলাম। ওর নাম রাখলাম রানী।

এদিকে আমাদের বাড়িতে কাঠবেড়ালি রাখার জায়গা কই ? একটা কাগজের বাক্সের গায়ে হাওয়া যাবার ছ্যাঁদা করে, তার মধ্যে রাতে ওকে রাখলাম।

পরদিন কাকু একটা পাখির খাঁচা কিনে দিলেন। রানীকে খাঁচায় পুরে আমার ঘরের ছাদ থেকে ঝুলিয়ে রাখলাম। খাঁচার ভিতরটা ওর জন্য বেশ একটা বাসার মতো করে সাজিয়ে দিলাম। শোবার জন্য ছোট্ট বিছানা করে দিলাম। খাবারের জন্য খুদে একটা থালা রাখলাম, জলের জন্য পেয়ালা রাখলাম।

প্রথম প্রথম ওকে খাইয়ে দিতে হত। কিন্তু অল্প দিনের মধ্যেই নিজে খেতে শুরু করল। ওকে দুধ, বাদাম আর ফল দিতাম।

ক্রমে রানী বড় হতে লাগল ; দৌড়ে বেড়াত, আমার সঙ্গে খেলা করত। নাম ধরে ডাকলে আমার কাছে ছুটে আসত। যেখানে যেতাম পিছন পিছন যেত।

একদিন ওকে বাগানে নিয়ে গেলাম। ও তো মহা খুসি। গাছপালা ঝোপঝাড়ের মধ্যে ছুটোছুটি করতে লাগল। তারপর একটা গাছে চড়ে, পাতার মধ্যে লুকিয়ে পড়ল। ডাকতেই আবার নেমে এল।

রানী আরো বড় হলে, ওকে ইচ্ছামতো ঘুরে বেড়াতে দিতাম। খাঁচার দরজা সর্বদা খোলা থাকত, যাতে যেমন খুসি যাওয়া আসা করতে পারে।

শেষে রানী একাই বেরিয়ে যেতে আরম্ভ করল। সকালে নেমে এসে কিছুক্ষণ আমার সঙ্গে খেলা করত, তারপর বাগানে বেরিয়ে যেত। গাছে চড়ত, ফল খেত, সারাদিন গাছে গাছে খেলে কাটাত।

ততদিনে রানী বড় হয়ে গিয়েছিল। মাঝে মাঝে রাতে ওকে ডাকতাম, তখনি জেগে উঠে আমার কাছে দৌড়ে আসত। পরে আর রাতে ওর ঘুমের ব্যাঘাত করতে ইচ্ছা করত না।

অনেক সপ্তাহ ধরে রানীকে দেখি নি। তারপর হঠাৎ একদিন বাগানে দেখা পেলাম। এবার ও একা নয়, সঙ্গে আরেকটা কাঠবেড়ালি। আমি যেই 'রানী' বলে ডাকলাম, একবার চেয়ে দেখে, কাছে এল। ওর সঙ্গীটি এক দৌড়ে গাছে চড়ে, আমাদের দেখতে লাগল।

সেই রাতে একবার দেখতে ইচ্ছা করল রানী বাড়িতে আছে কি না। ডাকলাম ; এল না। খাঁচা দেখলাম, রানী নেই। রানী কোথায় চলে গেছে।

রানী আমাকে ফেলে চলে গেছে বলে খুব দুঃখ হল। তবু ভাবলাম ওর যেখানে ভালো লাগে, সেখানেই যাক।



হয়তো বন্ধুর কাছে গেছে। হয়তো তার সঙ্গে থাকার ইচ্ছা হয়েছে।

তারপর অনেক মাস কেটে গেল, রানীকে একরকম দেখতেই পেতাম না, প্রায় ভুলেই গেলাম।

এক দিন সকালে ক্রমাগত কাঠবেড়ালির ডাক শুনতে পেলাম। তারপর দেখলাম কাঠবেড়ালিটা আমার দিকেই ছুটে আসছে। রানীই বটে। আমার কাছে এসেই, আবার ফিরে রানী উঠোনের দিকে দৌড়ল। আবার আমার কাছে এল। বুঝলাম রানী কোনো বিপদে পড়েছে, সাহায্য চাইছে।

আমিও ওর পিছন পিছন উঠোনের দিকে গেলাম। গিয়ে দেখি একটা সাপ কাঠবেড়ালি ধরেছে। শিউরে উঠলাম। চেঁচিয়ে লোক ডাকতে লাগলাম। কাকু দৌড়ে এসে কাঠবেড়ালিটাকে বাঁচাতে চেষ্টা করলেন। একটা লম্বা লাঠি এনে, তার এক মাথা দিয়ে সাপটাকে চেপে ধরলেন। সাপ কাঠবেড়ালিটাকে ছেড়ে দিল। লাঠি তুলে নিতেই গুড়গুড় করে সাপটা চলে গেল।

কাঠবেড়ালিটা স্থির হয়ে মাটিতে পড়ে রইল। তুলে দেখি মরে গেছে। বুঝলাম ও-ই হল রানীর বন্ধু। ওকে বাঁচানো গেল না বলে বড় দুঃখ হল। ওকে মাটিতে নামিয়ে রেখে, সরে দাঁড়ালাম।

রানী গাছের উপর থেকে সব দেখেছিল। এবার নেমে সে বন্ধুর কাছে গেল। কিছুক্ষণ তার সারা গা। শুঁকল, তারপর টের পেল বন্ধু মরে গেছে। অমনি সে গাছে ফিরে গেল।

হঠাৎ একটা চিল ছোঁ মেরে মরা কাঠবেড়ালিটাকে নিয়ে, উড়ে চলে গেল। রানী চিৎকার করে উঠল। আমরা সবাই দাঁড়িয়ে রইলাম, কিছু করতে পারলাম না। রানী ডাকতে ডাকতে গাছ বেয়ে উপরে উঠে গেল।

মনে হল আগের চেয়েও এখন তার বেশি ভয় হয়েছে। আমরা দেখলাম রানী গাছের একেবারে মাথায় উঠে, একটা বাসার মধ্যে ঢুকে গেল। আর ওকে দেখা গেল না। কাকু বললেন, 'ঐখানে ওর বাসা। নিশ্চয় ওখানে ওর বাচ্চা আছে। নিশ্চয় বাচ্চার কথা মনে পড়েছে, তাই তার দেখাশুনা করতে গেছে।'





সারাদিন রানীর কথা মনে হচ্ছিল, ওর জন্য বড় দুঃখ হচ্ছিল।

সন্ধ্যাবেলায় একা ঘরে বসে আছি, এমন সময় কাঠবেড়ালির ডাক শুনলাম। রানী এসেছে, মুখে একটা বাচ্চা নিয়ে। কাছে এসে আস্তে আস্তে বাচ্চাটাকে সে নামাল। বুঝতে পারলাম না বাচ্চাকে কেন আমার কাছে এনেছে। কি করব ভেবে পেলাম না।

দাদু, ঠাম্মু, কাকুকে ডাকলাম। ওঁরা তক্ষুণি এলেন। রানী তার বাচ্চাকে আমার কাছে নিয়ে এসেছে দেখে সবাই অবাক। তারপর কাকু বললেন, 'সাপ আর চিল দেখে রানীর ভয় হয়েছে। ওর ইচ্ছা, যতদিন না বাচ্চাটা বড় হয়, তুমি তাকে রক্ষা কর।'

তখন আমি পুরনো খাঁচাটাকে বের করে, আবার ছাদে ঝুলিয়ে দিলাম। বাচ্চাটাকে খাঁচার ভিতরে রেখে দিলাম। খাঁচার মধ্যে বাচ্চাকে দেখে, রানীও সেখানে ঢুকে পড়ল। তারপর তাকে খাওয়াতে লাগল।

আমরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলাম। দাদুর মনে বড় লাগল। তিনি হাত জোড় করে ভগবানের কথা চিন্তা করতে লাগলেন। তাঁর গাল বেয়ে চোখের জল পড়ছিল। দাদু বললেন, 'সবই ভগবানের খেলা। সব তাঁরি ভালোবাসা।'